কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন
করা যায়?

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালার জন্যে, এবং অজস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী রাসুল গনের উপর|

বেশ কিছুদিন আগে, কুয়েতী দা'য়ী মিশারী আল-খারাজ এর উপস্থাপনায় "كيف تتلذذ بالصلاة؟" নামে একটি আরবি প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়েছিল যার মানে হলো: "কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?" আমা...দের প্রায় সবারই নামাজের 'খুশু' কমবেশি হয়ে থাকে| খুশু কী? এটা আসলে অন্তরের

বা মনের একটি অবস্থা যা নামাজে প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও বিনম্রতা বজায় রাখে; যা হৃদয় থেকে বর্ষিত হয়ে আমাদের আল্লাহর সামনে বিনম্র ও আত্মসমর্পিত করে|

কোন কোন সময় নামাজে আমাদের আরাধনা এমন হয় যেনো আমরা প্রতিটা শব্দ কে ভেতর থেকে অনুভব করি; আবার অন্য সময় নামাজ শুধু নিয়ম মেনে উঠাবসা ছাড়া আর কিছুই হয় না| ইনশা-আল্লাহ, আমরা আগামী কিছুদিন নামাজের অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করব|

এক আনসারী ও এক মুহাজির এর কাহিনী:

সুনানে আবু দাউদ থেকে হাসান সনদে বর্ণিত; কোন একটি যুদ্ধের সময় নবী(সা:) দুজন পাহারাদার নিয়োগ করেন, তাদের একজন ছিলেন মুহাজিরীন, আরেকজন ছিলেন আনসার| একটা সময় আনসারী সাহাবী নামাজের জন্য উঠে পড়লেন অপরদিকে মুহাজিরীন সাহাবী তখন ক্লান্তিতে তন্দ্রা মতো এসেছিলেন| এই সময় প্রতিপক্ষের এক মুশরিক এই অবস্থা দেখে সুযোগ বুঝে আনসার সাহাবীর দিকে তীর ছুড়ে মারেন| এটা তাঁর গায়ে লাগে, কিন্তু তবুও কষ্ট করে তীর বের করে রক্তাক্ত অবস্থায় নামাজ চালিয়ে গেলেন| এটা দেখে ঐ মুশরিক আবার তীর নিক্ষেপ করলেন| আবারও আনসার সাহাবী তীরটি অপসারণ করে নামাজ চালিয়ে গেলেন| কিন্তু যখন তৃতীয় তীর আঘাত হানল; তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না এবং তিনি রুকু এবং সেজদায় চলে গেলেন, এর মাঝে মুহাজিরীন সাহাবীর ঘুম ভেঙ্গে যায়(মুশরিক তা দেখে পালিয়ে যায়), এবং তাঁর সাথীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে উঠে বললেন "সুবহান-আল্লাহ! যখন প্রথম সে তোমাকে আঘাত করেছিলো আমাকে কেন ডাকলে না?" আনসারী সাহাবীর উত্তর ছিল, "আমি তখন এমন একটি সুরা তিলাওয়াত করছিলাম যা আমি ভালবাসি, আর আমি সেটা থামাতে চাচ্ছিলাম না|" আল্লাহ আকবার, আমাদের পক্ষে কী কল্পনা করা সম্ভব কী পরিমান আবেগ ও নিষ্ঠা ছিলো তাঁর নামাজে?

নামাজের মধুরতা:

নামাজ হল সর্বোত্তম ইবাদত| যখন কেউ নামাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে সালাম ফেরায়(তাসলিম) তখন সে নিশ্চিত ভাবেই এক প্রশান্তি লাভ করে| ইবনে আল যাওজী নামাজের ব্যাপারে বলেন:

إنا في روضة طعامنا فيها الخشوع و شرابنا فيها الدموع

"আমরা এমন এক উদ্যানে অবস্থান করি যেখানে আমাদের খাদ্য হল খুশু আর পানীয় হল অশ্রু"
যে নামাজে পূর্ণভাবে আরাধনা করে তার আত্মা তার কাছে আর থাকেনা; যেমন ইবনে তায়মিয়্যাহ বলেন, তার রুহ আসলে আল্লাহর আরশের তাওয়াফ করতে থাকে|

কেউ একথা বলতে পারেন যে এরাতো আগের জামানার মানুষ| এখন কেউ এরকম অনুভব করেন না| কিন্তু এ কথা মোটেও সত্য নয়; যে কেউ নামাজের এই অমৃতসুধার সন্ধান পেতে পারে, আর এর জন্য দরকার নামাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং খুশু অর্জনের রহস্য উন্মোচন করা| আর এর মাধ্যমেই নামাজ হতে পারে আমাদের সব কিছুর সমাধান; সব দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি ও হতাশার ঔষুধ, এমন কিছু যার মাঝে আমরা পরম প্রশান্তি লাভ করি; এমন কিছু যা আমরা চাই কখনও শেষ না হোক|

চলুন তাহলে শুরু করি রহস্য উন্মোচন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন|

১: প্রথমত আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো খুশু সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করতে হবে| খুশু মানে শুধু এই না যে আপনি খুবই কষ্ট করে এমন মনোনিবেশ করেছেন যে আপনাকে আর ভিন্নমুখী করা সম্ভবই নয়| একাগ্রত হৃদয় বা মন হল খুশুর প্রথম স্তর| অনেকটা এরকম যে আপনি কেবল একটি বাড়ির দরজা খুলেছেন, এখনো পুরো বাড়িটা দেখা বাকি আছে| খুশুর গভীরতা অসীম|
অনেকেরই এটা মনে হয় যে মনকে একাগ্রত করা, নিজের চিন্তা চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন কাজ| এই ধারনাকে নির্মূল করতে নামাজে আসার সময়ই আমাদের নামাজের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসতে হবে| ধরা যাক আমাদের প্রতি নামাজে ১০ মিনিট সময় লাগে| মানে দিনে ৫০ মিনিট; এক ঘন্টাও না| বাকি তেইশ ঘন্টা আমার দুনিয়ার জন্য| এই পঞ্চাশটা মিনিটও কী আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য দিতে পারিনা? এইটুকু সময়েও কী আমরা দুনিয়ার জিনিস নিয়ে ভাববো?

নামাজ শুরুর আগে এই কথা গুলো মনে মনে ভাববেন, যাতে আমাদের নফস আমাদের এই বলে ধোঁকা দিতে না পারে যে "নামাজে মনোযোগ দেয়া খুবই কঠিন"-কারণ এটা খুবই সম্ভব একটা কাজ; মনে রাখা উচিত আল্লাহর সামনে দাড়ানোর আনন্দ/মিষ্টতা দুনিয়ার যেকোনো প্রলোভনের চেয়ে অনেক অনেক আকাঙ্ক্ষিত, অনেক সুখের| শুধু একবার তা অনুভব করলে আর কিছুতেই মন উদাস হবে না|

নামাজের গভীরতা:

নামাজের আসল স্বাদ আস্বাদনের অন্যতম একটি উপায় হলো; নামাজ বুঝে বুঝে পড়া| কী তিলাওয়াত করা হচ্ছে তা বোঝা ও তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা| ঐ প্রোগ্রামটিতে, মিশারী আল-খারাজি বলছিলেন: "চলুন পরিচয় করিয়ে দেই নামাজে আপনার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগীকে|" জানেন কাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন?

মসজিদের একটি স্তম্ভ(pillar)কে! জি হ্যাঁ, মসজিদের মাঝে দাড়িয়ে থাকা স্তম্ভ| যেকোনো স্তম্ভ; তা সে বাড়িতেই হোক, অফিসে হোক আর মসজিদেই হোক তা আপনার প্রতিযোগী|কেন?

কারণ যদি আপনি নামাজে দাড়িয়ে থাকেন, স্তম্ভ আপনার চেয়ে বেশি সময় দাড়িয়ে থাকে| যখন সিজদা
করেন, আপনার চেয়ে বেশি সময় ধরে সিজদাহ করে সেই স্তম্ভ| যখন তাসবীহ পরেন, এটা আপনার চেয়ে অনেক বেসি তাসবীহ পড়ে| কিভাবে? আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

“তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই৷ এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না,” [সুরা বাণী ইসরাইল ১৭:৪৪]

এবং

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ

وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ

“তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত, সবকিছুই যা আছে আকাশে ও পৃথিবীতে- সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে? আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই আল্লাহ যা কিছু চান তাই করেন।” [সুরা হাজ্জ ২২:১৮]

যদি আমরা পিলারকে জিগ্যেস করি, তোমরা কী বুঝো? তা কখনই উত্তর দিতে পারবে না| এখন যদি আমরা আমাদের জিগ্যেস করি- আমরা তাদের চেয়ে কতটা বেশি ভালো? যখন আমরা বলি “সামি’আল্লাহু লিমান হামিদা” এর মানে কী? কিংবা তাহিয়্যাত(আত্তাহিয়াতু)ই বা কী বোঝায়? শুধু শাব্দিক অর্থই নয়; এগুলোর সুনির্দিস্ট অর্থ কী? এগুলো বলার কারণ ও উদ্দেশ্যই বা কী? ইনশা-আল্লাহ আগামী পর্বগুলোতে আমরা নামজের প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব যাতে আমরা খুশু অর্জন করতে পারি|

শেষ কথা....

এ কথা বলা ঠিক হবে না যে “কিন্তু...আমি পারিনা!” আল্লাহ কিভাবে আমাদের খুশু অর্জনের কথা বলতে পারেন যদি তা অসম্ভবই হবে? আল্লাহ তায়ালা উদার; তাঁর উদারতার সীমা নেই, আমাদের

কল্পনার বাইরে; আমরা যদি তাঁর দিকে এক পা অগ্রসর হই, তিনি আমাদের দিকে ছুটে আসবেন| আল্লাহ বলেন:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার জন্য সংগ্রাম- সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো। আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশালীদেরই সাথে আছেন।" [সুরা আনকাবুত ২৯:৬৯]

তাই বিসমিল্লাহ(আল্লাহর নামে) ও ইনশা-আল্লাহ, চলুন পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ আমাদের সবার খুশু বাড়িয়ে দেন এবং নামাজের প্রশ্নটিকে উপলব্ধি করার তৌফিক দেন| আমীন|

চলবে...ইনশাআল্লাহ

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আবু নুয়াস এর তাওবা:

আবু নুয়াস এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যে কিনা খুব মদ পান করতো এবং অশ্লীল ...কথাবার্তা বলতো; সে বিভিন্ন অসংলগ্ন বিষয় কল্পনা করে নিয়ে কবিতা বানাতো ও তা আবৃতি করে বেড়াতো| যাইহোক, সে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে| মানুষজন এতে খুব অবাক হয় যে- “আবু নুয়াস? যে কিনা মাতাল হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত? যে কিনা একটা লম্পট?” এটা একরকম সবারই বিশ্বাস ছিলো যে আল্লাহ তাকে কখনই ক্ষমা করবেন না, আল্লাহ তার প্রতি করুনা করবেনই না| তাই

সে নতুন একটি কবিতা রচনা করে- যেটা তার মৃত্যুর পর তার বিছানার নিচে থেকে পাওয়া যায়: কবিতার বাণী গুলো অর্থ অনেকটা এরকম ছিলো–

“হে আমার রব, যদিও আমার পাপ অসংখ্য কিন্তু আমি জানি তোমার ক্ষমা তার চেয়েও অনেক বিশাল
যদি শুধু পুণ্যবানরাই তোমাকে ডাকে, তুমি কী অপরাধীদের ফিরিয়ে দিবে?
হে আমার রব আমি তোমার পানে চেয়ে আছি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে, যে ভাবে তুমি চেয়েছ,
এখন যদি তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও, আর কে আছে যে আমাকে রক্ষা করবে?”

কেমন লাগছে আপনাদের?

গতকাল আমরা কথা বলেছিলাম দুটি বিষয় নিয়ে;

১: নামাজে নিজেকে একাগ্রত রাখা

২: প্রতিটা কাজ বুঝে বুঝে অন্তর থেকে অনুভব করে, চিন্তা করে করা|

আজকে, ইনশা-আল্লাহ নামাজের আরো গভীরে প্রবেশ করব| আমাদের বেশির ভাগেরই নামাজে আমরা কোন আবেগ অনুভব করিনা| যখন আমরা কোন বন্ধুর সাথে দেখা করি আমরা আনন্দ অনুভব করি, যখন কেউ দুরে চলে যায় তখন দুঃখ অনুভব করি, কেউ যখন অনেক দিন ধরে দুরে থাকে আমরা তার অভাব অনুভব করি| বন্ধুদের জন্য আমরা কতই না আবেগ আক্রান্ত হয়ে থাকি; অথচ নামাজের সময় আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করি কিন্তু আমরা কিছুই অনুভব করি না| এ কারণেই নামাজ আমাদের উপর কোন কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারছে না|

তাহলে, আমাদের কী অনুভব করা উচিত? চলুন জেনে নেই|

গভীরতার তৃতীয় স্তর:

এই তৃতীয় স্তর কোনটি? ক্ষমা ও করুনা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে আসা| এবং এই আশা করা যে ইনশা-আল্লাহ তিনি আমাদের কবুল করবেন এবং আমাদের তাঁর আরও নিকটে নিয়ে আসবেন| এই তৃতীয় স্তর টিকে বলা হয় "রযা"| যে ব্যক্তি এই 'রযা' অনুভব করতে পারে তার অবস্থান আল্লাহর কাছে অনেক উচুতে| কারণ এটা অন্তরের ব্যপার| হাজার মনোযোগ দিয়ে, আর বুঝে কীই বা লাভ যদি সবকিছু যান্ত্রিক হয়? নামাজের সত্যিকারের স্বাদ আহরণ তখনি সম্ভব যখন আমরা তাঁর(আল্লাহর) কাছে 'রযা' নিয়ে দাড়াবো|

এটা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব?

এটা অনুভব করা সম্ভব যদি আপনি আল্লাহকে জানেন, চিনেন| আল্লাহ তায়ালাকে যতবেশী চিনবেন, তত আল্লাহর 'রযা' লাভ করবেন| আমাদের প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহর করুনা আমাদের মায়ের করুনার চাইতেও অনেক অনেক বেশী| আমাদের যা করতে হবে তা হল আল্লাহর কথা বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে, তাঁর গুনাবলী নিয়ে আলোচনা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে| আমরা যা ভাববো তিনি তাই; যদি আমরা তাকে অসীম দয়ালু ও পরম করুনাময় মনে করি, তাহলে তিনি তাইই| খুবই সোজা সরল কথা-কারণ আল্লাহ তায়ালা এ কথা নিজেই বলেছেন: নবী(সা:) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমার বান্দা যা মনে করে আমি সে রকমই, তাই সে যেনো এমন কিছু ভাবে যাতে সে খুশি হয়|'|"

এইসব কথার মর্মার্থ নিয়ে যদি আমরা আমাদের নামাজ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের নামাজে তার সু-প্র্রভাব পরবে| ইবনে আল-কাইয়িম বলেছেন: "তোমার প্রতি আল্লাহর কোন ক্ষোভ নেই যে তিনি তোমাকে শাস্তি দিয়ে তার জ্বালা মিটাবেন|"

মানে আমাদের প্রতি তাঁর কোনই ক্ষোভ নেই এবং তিনি চানও না আমাদের শাস্তি দিতে| তাঁর করুনা তাঁর আযাবের চেয়ে অনেক বেশী| রহমত করাকে তিনি তাঁর নিজের করে নিয়েছেন| আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন[সুরা আনআম ৬:৫৪]

সুবহান-আল্লাহ(গৌরব, অহংকার এবং মহিমা আল্লাহরই)-আমরা প্রায় সবাই বছরের পর বছর ধরে নামাজ পড়ে চলেছি অথচ কখনও আবেগ সহকারে আল্লাহর নিকটে আসতে পারিনি, তবুও তাঁর কাছে করুনা প্রার্থনা করা তিনি পছন্দ করে চলেছেন| আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

“হ্যাঁ, আল্লাহ তো রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও।আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ হাল্‌কা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে

সৃষ্টি করা হয়েছে।” [সুরা নিসা ৪:২৭-২৮]

এর পরের নামাজে এই পন্থা প্রয়োগ করে দেখুন

নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন যে আল্লাহতায়ালা আপনাকে ক্ষমা করে দিতে চান, মার্জনা করে দিতে চান এবং আপনার প্রতি করুনা বর্ষণ করতে চান| বিশ্বাস করুন এবং মনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করুন যেনো তিনি আপনাকে জান্নাতুল ফিরদাউস করেন, এবং শুধু তাইই না, আপনি যেনো জান্নাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশী হোন| এগুলো আকাশচুম্বী কল্পনাপ্রসূত কোন গল্প নয়| বরং আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। *[সুরা গাফির ৪০:৬০]*

নবী(সা:) বলেন: *“আল্লাহর কাছ থেকে নিশ্চয়তার সাথে প্রার্থনা করো|”*যদি আপনি তা করেন; আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তার থেকেও অনেক বেশী দান করবেন| কিন্তু মনে রাখবেন এসব চাইতে হবে ‘রযা’ অবস্থায় “আমানি” অবস্থায় না| পার্থক্য কোথায়?

‘রযা’ হল এতক্ষণ ধরে যা বলা হল তা সব, কিন্তু এসব করতে একাগ্র চিত্তে ও পরিশ্রমের মাধ্যমে; একবারে না হলে পুনরায় চেষ্টা করতে হবে, চাইতে হবে আল্লাহর কাছে তিনি যেনো আপনার জন্য ‘রযা’ পাওয়াকে সহজ করে দেন, যদি তা না করি তাহলে সেটা হল ‘আমানি’..সঠিক একাগ্রতা আর অধ্যাবসায় ছাড়া এমনি এমনি আল্লাহর করুনা প্রার্থনা করা- তিনি(আল্লাহ) তা করা পছন্দ করেন না|

আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। [সুরা তাহা ২০:৮২]

আর এমন করলেই তিনি আপনাকে আপনার প্রতাশার চাইতেও বেশী কিছু দান করবেন|

আল্লাহর করুনা:

আল্লাহ তাঁর করুণাকে ৯৯ ভাগে ভাগ করেছেন, এবং তার মাত্র একটি ভাগ তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন| এই এক ভাগই এত শক্তিশালী যে তা সৃষ্টির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মায়েদের, বাবাদের, সন্তানদের, স্বামীদের, স্ত্রীদের এমনকি সকল পশু প্রানীদের মাঝে এমন ভাবে বিদ্যমান- যে সন্তান যতই যা করুক মা তাঁর সন্তানের একটু কষ্ট দেখলে কী যন্ত্রনাই না পায়; কোন বাবা তার সন্তানের জন্য কত কী না করেন; জন্ম দেয়ার পর মা কিভাবে আগলে রাখে তার সন্তান দের....আরো কত...|আরেকটি উদাহরন দেই-নিজের জন্মের আগের অবস্থা কল্পনা করুন - কিছুই ছিলেন না আপনি, নয় মাস মায়ের পেটে থেকে মাকে ব্যথা দিয়েছেন, এত কষ্ট দিয়েও ক্ষান্ত হননি, পৃথিবীতে আসার মুহূর্তেও মাকে দিয়েছেন কী অসম্ভব কষ্ট, কী পরিমান কষ্ট সয্য আপনার মা আপনাকে জন্ম দিলেন অথচ জন্মের পরপরই আপনিই হয়ে গেলেন তার নয়নমনি, আদরের ধন ...একবার কী চিন্তা করেছেন আপনি কী এমন করেছিলেন যে আপনি আপনার মার এত ভালোবাসা, দয়া, করুনার পাত্র হয়ে গেলেন? এসবি যদি সেই একটি ভাগেরই অংশ হয়ে থাকে তবে বাকি ৯৯ ভাগের কথা কী কল্পনা করা সম্ভব? কখনই না ..তার করুনা অসীম; শেষ বিচারের দিন তিনি যখন এই সমগ্র করুনা নিয়ে আমাদের বিচার করবেন তখন কী অবস্থা হতে পারে? এটা কী আমাদের আবৃত না করে পারবে? আমাদের চেয়ে অনেক পাপী মানুষ যাদের আল্লাহ তাঁর

স্বীয় করুনায় ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেমন সেই মানুষটি যে ৯৯জনকে হত্যা করেছিলো তারপর আরও একজন কে হত্যা করে ১০০ পুরো করছিলো আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন | তাহলে কিভাবে তিনি আমাদের ক্ষমা ও করুনা না করে থাকতে পারেন?

তাহলে আপনি আমি কী তাঁর অসীম করুনার ভাগিদার হতে পারিনা? অবশ্যই পারি| চলুন তাহলে আজ থেকেই এভাবে নামাজ পড়ি ও প্রার্থনা করি|

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ৩

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আলী(রা:) এর নামাজ:

যখন নামাজের সময় হত, আলী(রাদি আল্লাহ আনহু- আল্লাহ তাঁর উপর রাজি ও খুশি হোন) কাঁপতে শুরু করতেন এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত| যখন তাকে জিগ্যেস করা হল, "অসুবিধা কি?" তিনি উত্তর বলেন, "এমন একটি আমানতের সময় শুরু হচ্ছে যে আমানতের ভার জান্নাত, পৃথিবী ও পাহাড়ে...র উপর অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করতে নিজেদের দুর্বল মনে করেছিলো(সুরা আল আহজাব ৩৩:৭২) আর আমি এখন সেই আমানতের ভার নিতে যাচ্ছি|"

তাদের নামাজ আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল, কারণ নামাজে তাদের আবেগ-অনুভুতি ছিলো ভিন্নতর| আমরাও নামাজের মধুরতার সেই অনুভুতিগুলো আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে চাই|

আগের পোস্ট দুটিতে এখন পর্যন্ত আমরা জেনেছি যে একাগ্র থাকতে হবে, বুঝে শুনে, গভীরভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে এবং রযা(যা আগের নোট এ বর্ণিত) অর্জন করতে হবে| এখন আমরা এই রযাকে আরেকটি অনুভতির সাথে মেলাবো|

শুরু করার আগে বলে নেই যে, এখনো আমরা নামাজের প্রস্তুতি পর্যায়েই আছি, এখনো নামাজের আসল স্বাদ আস্বাদনের রহস্য উন্মোচন শুরু করিনি| আজকেও শুরু হবে না তবে ইনশা-আল্লাহ খুব তারাতারিই শুরু হবে- একটু ধৈর্য ধরে সাথেই থাকবেন আশা করি|

হায়বা

হায়বা হল এমন এক ধরনের ভয় যা আমাদের আল্লাহ তায়ালার প্রতি থাকা উচিত| দুঃখজনক হলেও সত্যি যে যখন আরবি 'হায়বা', 'খশিয়া', 'খউফ' ইত্যাদিকে অনুবাদ করা হয়, এসবের আসল অর্থ গুলো হারিয়ে যায়| এই তিনটি শব্দকেই বাংলায় অনুবাদ করা হয় 'ভয়' দিয়ে, অথচ এদের মাঝে সূক্ষ্ম এবং জটিল পার্থক্য রয়েছে|

ইবনে আল-কায়য়িম বিচক্ষনতার সাথে এই পার্থক্য গুলো তুলে ধরেছেন:

‘খউফ’ মানে হল এমন ভয় যার কারণে ভয়ের সেই বস্তু থেকে মানুষ দুরে থাকতে চায়; এর জন্য জিনিসটি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকলেও আমরা ভয় পাই| যেমন অন্ধকারে আমাদের ভয় লাগে বা ‘খউফ’ অনুভব করি| তাহলে এটা হল অজান্তেই যে সব ভয় পাই সেগুলো|

অন্যদিকে ‘খশিয়া’ হল একটা জিনিস সম্পর্কে জেনে শুনে ভয় পাওয়া| যেমন অনেকে কুকুর ভয় পায়, অনেকে সাপ দেখলে রাতে ঘুম আসেনা| আল্লাহ তায়ালাকেও অনেকে খুব ভয় পান, যে জাহান্নাম সম্পর্কে যত বেশি জানতে থাকে, এ দুনিয়ার আযাব সম্পর্কে যত বেশি জানতে থাকে, কবরের আযাব নিয়ে যতবেশী জানতে থাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমাদের ‘খউফ’ ধীরে ধীরে ‘খশিয়া’তে পরিনত হতে থাকে| যেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“….আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞান সম্পন্নরাই তাকে ভয় করে…..।” [সুরা ফাতির ৩৫:২৮]

কিন্তু “হায়বা” হল কারো সম্মান, শ্রদ্ধা, মহিমা, ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সহকারে ভয়| উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- আমরা আগুনকে ভয় পাই, কারণ আমরা জানি আগুন আমাদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু আগুনের কোন ‘হায়বা’ নেই; আমরা তাকে কোন শ্রদ্ধা দেখাইনা, এটা হল ‘খশিয়া’| কিন্তু আমাদের পিতা-মাতাদের, শিক্ষকদের ‘হায়বা’ আছে, কারণ যখন আমরা খারাপ কিছু করি তখন তাদের ভয় করি, তাদের সামনে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করি- তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার কারণে|

প্রথমে ‘রযা’, আবার এখন ‘হায়বা’?

এই দুইটা অনুভুতি তো পরস্পর বিরোধী| তাহলে, কিভাবে আমরা এই দুটিকে এক জায়গায় করতে পারি? আসলে এটা একদমই কঠিন কোন কাজ না, আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই এই

কাজটা করে থাকি যখন চারপাশের মানুষের মাঝে চলাফেরা করি| যেমন একজন ছাত্র প্রশ্ন কমন না পেলে হাবিজাবি অনেক কিছুই লেখে দিয়ে আসে পরিক্ষার খাতায়, সে জানে যে তার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে এবং হয়তো পাসও করবে না তবুও একইসাথে সে এই আশাও করে যে স্যার হয়তো দয়া করে পাস করে দিবেন, এটাই হল রযা এবং হায়বা একত্রে|

আল্লাহতায়ালার ব্যাপারেও অন্যকিছু না| আমাদের কৃত পাপ সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি, এইসব পাপ স্মরণে রেখে যখন আল্লাহর নিকটে আসি, আমাদের মনে শাস্তির অনেক ভয় থাকে কিন্তু একইসাথে আমরা তাঁর অসীম করুনায় ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা করি| এটা আরো স্পষ্টরূপে বোঝা যায় 'সায়্যিদ আল-ইস্তিগফার' বা ক্ষমা চাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ায়, যা প্রত্যেক সকালে ও সন্ধায় পড়তে বলা হয়, যেটা নবী(সা:) ক্ষমার চাওয়ার সেরা উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেই দুয়াতে:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَمَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

"আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন্তা খালাকতানি ওয়া আনা আ'ব্দুকা, ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত'তু, আ'উজু বিকা মিন শাররী মা সানা'তু, আবু-উ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়া, ওয়া আবুউ লাকা বিযানবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরু আজনুবা ইল্লা আন্তা" [সহিহ বুখারী ৭/১৫০, নাসাঈ, তিরমিজী]

অর্থ: ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার পালনকর্তা, কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয় একমাত্র তুমি ব্যতীত| তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমারই বান্দা| আমি আমার সাধ্যমতো যতটুকু পারি তোমারই নিয়ম ও আমার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চলি| আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই সব পাপ থেকে যা আমি করে ফেলেছি| আমি আমার ভুল স্বীকার করছি এবং আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি| আপনি আমাকে ক্ষমা করুনা; আপনি ছাড়া আর কেউ তো নেই যে আমায় ক্ষমা করতে পারে|"

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় এই দুয়ায় রযা এবং হায়বা দুটিরই সংমিশ্রণ ঘটেছে; আপনি আপনার ভুল গুলোও স্বীকার করেছেন, এবং সাথে সাথে প্রতাশায় আছেন যে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন|

এ ধরনের ভয়ের আসল সৌন্দর্য:

আমরা যা কিছু ভয় করি, আমরা সবসময় তার থেকে দূরে থাকি, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বাদে| আল্লাহর ভয় আমাদের আল্লাহর আরো নিকটে নিয়ে আসে| আল্লাহ বলেন:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। [সুরা যারিয়াত ৫১:৫০]

নবী(সা:) তাঁর দুয়ায় বলতেন:

لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك

"তোমার কাছে ছাড়া, তোমার (শাস্তি) থেকে বাঁচার আর কোন আশ্রয় বা নিরাপদ জায়গা নেই।"

নবী(সা:) আরো বলতেন:

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

"ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমারই পরিতোষে, তোমার ভয়ানক রোষ থেকে, এবং তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা করি তোমার

ভয়ংকর শাস্তি থেকে, তোমারই কাছে-তোমারই থেকে| তোমার উপযুক্ত প্রশংসা তো আমি কোনদিনও করতে পারবনা তা শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব|”

আল্লাহর শাস্তি চরম পর্যায়ের কিন্তু তাঁর কাছেই আমাদের ক্ষমা, তাঁর কাছ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করা| ইবনে আল-কায়য়িম এই দূ’আ সম্পর্কে বলেন এই শব্দ গুলোতে যে কি পরিমানে আল্লাহর একত্ববাদ, জ্ঞান ও দাসত্ব লুকিয়ে আছে-খুব উচুঁ স্তরের জ্ঞানীরা ছাড়া কেউই তা কেউ জানেনা| তিনি বলেন যে যদি কেউ এই দূ’আর অর্থ বিশ্লেষণ করতে চায় তাহলে বিশাল বই লিখতে হবে, আর এই জ্ঞানসমুদ্রে একবার ঢুকতে পারলে এমনসব কিছু তার সামনে উন্মোচিত হবে যা চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কেউ কখনো কল্পনাও করেনি|

আল্লাহকে জানা এবং নিজেকে জানা:

‘হায়বা’ হল সর্বোচ্চ স্তরের ভয়, যার সাথে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও জ্ঞান মিশ্রিত রয়েছে| এই ভয় বাড়তে থাকে যখন বান্দা আল্লাহর সম্পর্কে বেশী বেশী জানতে থাকে একইসাথে নিজেকেও চিনতে থাকে| যখন আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্পর্কে আমরা বেশী বেশী জানতে থাকি আমাদের ভয় বাড়তে থাকে| নবী(সা:) যে রাতে আল্লাহর কাছে উর্ধাগমন করেছিলেন, সে রাতের বর্ণনায় নবী(সা:) জিবরাইল(আ:), যাঁর কিনা ৬০০ পাখা রয়েছে এবং যিনি অহি নিয়ে আসার যোগ্যতায় ভূষিত, এর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা বর্ণনা করেছেন|

যখন আমরা আমাদের কৃত পাপের কথা স্মরণ করি তখনো আল্লাহর ভয় বাড়তে থাকে| আমরা আমাদের হীনতা ও দুর্বলতা বুঝতে পারি, আমাদের অবজ্ঞা আমাদের কাছে ধরা পরে যায় যে এত পাপ করার পরও কতখানি ধৈর্য ধরে আল্লাহ আমাদের শাস্তি না দিয়ে সুযোগ দিয়ে চলেছেন|

সব ধরনের ভয়ই আমাদের বিচলিত করে শধু আল্লাহর ভয়, হায়বা, ছাড়া, কারণ এই ভয়ের কারণেই আমরা প্রবল আশায় বুক বাঁধি যে আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করবেন এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন|

চলুন তাহলে আজ থেকে নামাজে রযার সাথে সাথে হায়বা-কে এক সাথে জুড়ে দিই|

[চলবে....ইনশা-আল্লাহ]

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ৪

রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

আবেগ-অনভূতির সর্বোচ্চ শিখর:

আজ আমরা আরো গভীরে প্রবেশ করব; এখন পর্যন্ত আমরা একাগ্র হয়েছি, যা উচ্চারণ করি তা অর্থ বুঝে করি, এবং দুই ধরনের আবেগ নিয়ে নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, আর আজকে আরো এক ধরনের আবেগ নিয়ে কথা বলবো|এই আবেগ নিয়ে নামাজে দাড়ালে আমাদের নামাজকে খুব কম সময়ের নামাজ বলে মনে হবে, কিন্তু নামাজ শেষ করে ঘড়ি দেখলে মনে হবে, "আরে! এত তারাতারি ১০ মিনিট পার হয়ে গেছে?" কিংবা ১৫ মিনিট বা ২০ মিনিট(ইনশা-আল্লাহ)| যে ব্যক্তি নামাজে এই আবেগটা প্রয়োগ করতে শুরু করবে তার ইচ্ছা হবে এই নামাজ যেনো কখনো শেষ না হয়|এটি এমন একটি আবেগ যা সম্পর্কে ইবনে কায়য়িম বলেন, "যার জন্যে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে....এটা হল আত্মার জন্য পুষ্টি আর চোখের জন্য শীতলতা|" তিনি আরো বলেন, "যদি হৃদয় থেকে এই অনুভুতি বের হয়ে যায়, এটা অনেকটা এমন যেমন প্রাণ ছাড়া শরীর|"

এই আবেগ কোনটি জানেন?

ভালোবাসা(الحب)

কিছু কিছু মানুষের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শুধু তাঁর আদেশ আর নিষেধ এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, যাতে সে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যায়| অবশ্যই আমাদের আদেশ, নিষেধ মেনে চলতে হবে, কিন্তু এটা শুধু ভয় আর আশা নিয়ে নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরম ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে করতে হবে| আল্লাহতায়ালা কোরআনে বলেন:

> ***'.....অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে|' [আল মাঈদা ৫:৫৪]***

সচারচর দেখা যায় যখন মানুষ তার পছন্দের মানুষের কাছে আসে, হৃদয়ে চাঞ্চল্যতা আসে, আন্তরিকতা আসে| কিন্তু আল্লাহর সাথে দেখা করার সময়, নামাজে আমরা বিন্দুমাত্রও এই আবেগ অনুভব করিনা| আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

“আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী|” [সুরা বাকারা ২:১৬৫]

যখন আমরা নামাজের জন্য হাত উপরে তুলি তখন সেখানে আল্লাহর জন্য আকুলতা থাকা উচিত, ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ থাকা উচিত কারণ আমরা এখন আল্লাহর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি|

নবী(সা:) এর একটি দূ’আ আছে:

اللهم إني أسألك الشوق الى لقائك

“ইয়া আল্লাহ, তোমার সাথে মিলিত হবার আকুলতা আমার হৃদয়ে স্থাপন করে দাও।” (নাসাঈ, হাকিম)

ইবনে আল কায়য়িম তাঁর ‘তারিখ আল-হিজরাতাঈন’ নামক বইতে বলেন আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসুলদের এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের ভালোবাসেন, এবং রাসূলগণ এবং মুমিনরাও তাঁকে ভালোবাসেন এবং তাদের কাছে আল্লাহতায়ালার চেয়ে বেশী প্রিয় আর কিছু নেই। পিতামাতার প্রতি ভালোবাসার মাধুর্য এক ধরনের, সন্তানের প্রতি ভালোবাসাও আরেক রকম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা অন্যসব কিছুর তুলনায় বেশী মাধুর্যময়। নবী(সা:) বলেছেন:

“ যে ব্যক্তি তিনটি গুনকে একত্রে সংযুক্ত করতে পারবে সে ঈমানের প্রকৃত মজা পাবে...”

প্রথম যে জিনিসটি তিনি(সা:) উল্লেখ করেন সেটা হল যে: *“..আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হতে হবে...”*

ইবনে আল-কায়য়িম বলেন, **“যেহেতু ‘কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়’**[সুরা আস-শুরা ৪২:১১] সেহেতু তাকে ভালোবাসার অনুরূপও আর কিছুই হতে পারেনা।”যদি আপনি এই ভালোবাসার গভীরতা ও মাধূর্য একবার অনুভব করতে পারেন, তাহলে আপনার আর নামাজ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করবে না।

আমি এই ভালোবাসা অনুভব করতে চাই; কিন্তু কিভাবে?

আপনি কি সত্যিই এই ভালোবাসা অনুভব করতে চান? তাহলে নিজেকেই জিগ্যেস করুন- কেন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসতে চান? কারণ এটা জেনে রাখেন যে মানুষ মূলত ভালোবাসে তিনটি কারণের যেকোনো একটির(অথবা কমবেশি মাত্রায় তিনটির জন্যই) জন্য:

১. তাদের সৌন্দর্যের জন্য;

২. তাদের মান-সম্মান বা উচ্চমর্যাদার জন্য;

৩. অথবা তারা আপনার জন্য ভালো কিছু করেছে এই জন্য;

আরও এটা জেনে রাখেন যে আল্লাহতায়ালা এই তিনটি গুনেই অন্য সবার চেয়ে অনেক অনেক উপরে|

১সৌন্দর্য .

সৌন্দর্য সবসময়ই আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়| এটা অনেকটা আমাদের ফিতরাত(যা প্রাকৃতিকভাবে থাকে)এর মতো| আলী ইবনে আবি তালিব (রাদি-আল্লাহু আনহু) নবী(সা:)সম্পর্কে বলেন যে "তাকে দেখে মনে হত তাঁর মুখ থেকে সূর্যের কিরণ বের হচ্ছে|" জাবির(রা:) বলেন: "রাসূলুল্লাহ(সা:) পূর্নিমার চাঁদের চেয়েও সুশ্রী, সুন্দর এবং উজ্জ্বল ছিলেন|" (তিরমিজী) আল্লাহতায়ালা তাঁর সকল নবী রাসূলগনকে অসাধারণ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যাতে মানুষ তাঁদের প্রতি প্রাকৃতিকভাবেই আকৃষ্ট হয়|

আর সৌন্দর্য শুধু মানুষের মুখের মাঝেই সীমাবদ্ধ না, সৌন্দর্য সকল সৃষ্টিজগতের মাঝেই ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রায়ই তা আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের করে বাকহারা এবং সাথে সাথে আমাদের দেয় এক স্বর্গীয় শান্তির অনুভুতি| পূর্ণিমা রাতের শান্ত চাঁদের আলো, পাহাড় বয়ে নেমে আসা স্বচ্ছ পানির ঝর্না, কিংবা সমুদ্র পাড়ের রক্তিম সূর্যাস্ত...ইত্যাদির সামনে এলে কেমন যেনো একটা গভীর অনুভুতি আমাদের মাঝে বয়ে যায় যা খুবই পবিত্র, আমাদের করে তোলে মোহিত, মুগ্ধ| অবশ্য আজকাল শহরের যান্ত্রিকতা আর রুক্ষতা অবশ্য আমাদের এই পবিত্র অনুভুতি গুলোকেও মলিন করে দিয়েছে|

আর আল্লাহতায়ালা হলেন সেই সত্তা যিনি এইসব সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করেছেন, সাজিয়েছেন, সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন| তাহলে আল্লাহর নিজের সৌন্দর্য কোন পর্যায়ের হতে পারে? ইবনে আল-কায়য়িম বলেন, "আর আল্লাহতায়ালার সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্যে এটা জানা থাকাই যথেষ্ঠ যে এই জীবন এবং এর পরের জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল সৌন্দর্য তাঁরই সৃষ্টি, তাহলে তাদের সৃষ্টিকর্তা কতটা সুন্দর হতে পারেন?"

আল্লাহতায়ালা সুন্দর, এ জন্যেই সৌন্দর্যের জন্য আকর্ষণ আমাদের ফিতরাত| আল্লাহতায়ালার একটি নাম হল আল-জামীল(যিনি সবচেয়ে সুন্দর)| ইবনে আল-কায়য়্যিম বলেন আল্লাহ তায়ালার সৌন্দর্য এমন যে কেউ শুধু তা জেনে রাখতে পারেন, তা কল্পনা করার ক্ষমতা কারোরই নেই| এই মহাজগতের সকল সৌন্দর্য একত্রেও তাঁর নিজের সৌন্দর্যের এক বিন্দুও নয়| ইবনে আল-কায়য়িম বলেন সুর্য কিরণের যেমন সূর্যের সাথে তুলনা হয় না, ঠিক তেমন যদি সময় সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামতের আগ

পর্যন্ত সকল কিছুর সৌন্দর্য একত্র করা হয়, তবুও তা আল্লাহর সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করারো যোগ্য হবে না| আল্লাহতায়ালা এত প্রবল সৌন্দর্যের অধিকারী যে এই জগতে আমাদের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই| পবিত্র কোরআনে, আল্লাহ তায়ালা মুসা(আ:)এর অনুরোধ বর্ণনা করেন:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

“তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তার পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে|’ তারপর যখন তার পরওয়ারদগার

পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন...।" [আল আরাফ ৭:১৪৩]

পাথরের পাহাড়ও আল্লাহর সৌন্দর্যের সামান্য জ্যোতি বহন করতে পারেনি এবং বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এবং এই ঘটনা দেখে মুসা(আ:) জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ কারণেই হাশরের ময়দানে সবকিছু আল্লাহর সৌন্দর্যে দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। আমরা শুধু তাঁর সৌন্দর্যের কথা আলোচনাই করতে পাড়ি কিন্তু তা অবলোকন করা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। এই বিশ্বজগতের এত সুন্দর, এত মোহনীয় সব জায়গা, জিনিস, মানুষ অথবা তাদের সবার সৌন্দর্য একত্রেও একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মাঝেই সীমাবদ্ধ; আসল মহিমা আর সৌন্দর্যতো আল্লাহতায়ালার। আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আর তখন শুধু বাকি রয়ে যাবে আপনার রবের মহিমা এবং সম্মান।[আর রাহমান ৫৫:২৭]

এসব কিছু ভেবেই, মহানবী(সা:) বলেছেন:

إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দার দিকে তাকান এবং যতক্ষণ সে নামাজে

থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফেরান না।(তিরমিজী)

নামাজে দাঁড়িয়ে এই কথা মাথায় রাখবেন, এবং প্রার্থনা করবেন যেন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে তাঁকে দেখার সুযোগ দেন।

এই ভালোবাসাকে কি আরও উপরে নিয়ে যেতে চান? তাহলে সাথেই থাকুন।

[চলবে..... (ইন শা-আল্লাহ)]

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়? পর্ব ৫

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

ভালোবাসা

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যত বেশী হবে, নামাজে খুশুও তত বাড়তে থাকবে| যখন অনেক পছন্দের মানুষের সাথে দেখা হয় তখনকার অনুভূতি আর সাধারণ মানুষের সাথে দেখা হওয়ার অনুভূতির বিস্তর ফারাক আছে|

আগের লেখাতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কারো প্রতি ভালোবাসা মূলত তার সৌন্দর্য, গুনাবলী এবং তার করা সাহায্য থেকে সৃষ্টি হয়; এবং আল্লাহতায়ালা এই তিনটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত| আমরা তার সৌন্দর্যের কথা তো আগেই বলেছি; কিন্তু তাঁর গুনাবলী কি কি? কিংবা তিনি আমাদের জন্যে কিই বা করেছেন? আমরা জানি একটা মানুষের চরিত্র বা তাঁর দোষ-গুন আমাদের সামনে আসে যখন আমরা তাদের সাথে চলাফেরা করি, তাদের সাথে মিশি| তাহলে আমরা আল-হালীম(সবচেয়ে বড় ধৈর্যধারণকারী), আর-রহীম(পরম করুনাময়) আল-কারীম(যিনি উদারতায় সর্বশ্রেষ্ঠ) আল-ওয়াদুদ(যিনি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন) সম্পর্কে কি জানি আর কি বলতে পারি?

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক:

ইবনে আল-কায়য়িম বলেন আমরা তাঁর করুনা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি যখন তিঁনি তার বান্দাদের সাথে অতি মধুর সুরে কথা বলেন| যখন তিনি সীমালংঘনকারীদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন তখন তিঁনি বলেন না যে “ওহে পাপিষ্ঠ!” বরং তিঁনি বলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু|” [আল-জুমার ৩৯:৫৩]

খেয়াল করুন কিভাবে মহান আল্লাহতায়ালা কিভাবে আমাদের সাথে কথা বলছেন| তিঁনি আমাদের চোখ দিয়েছেন, নাক দিয়েছেন, কান দিয়েছেন, মুখ সহ অন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছেন; তারপর আমরা সেগুলো দিয়েই তাঁর আদেশ অমান্য করে চলেছি, তারপরও তিনি আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না; বরং তিনি ধৈর্যধারণ করে আমাদের তাঁর দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে চলেছেন| আবার যখন আমরা তাঁর কাছে হাত তুলে তাওবা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করি তিঁনি আমাদের সকল পাপ এমনভাবে মুছে দেন যেনো তা হয়তো কখনো করাই হয়নি|

একবার ভেবে দেখুন কিভাবে আল্লাহতায়ালা আমাদের কতবার কত বড় বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন| এমন কতো সময় গেছে যে আপনি ভেবেছেন কত বড় সর্বনাশই না হয়ে গেলো, আল্লাহর কাছে কতইনা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অথচ পরে সবকিছুর পরিনাম দেখে বলেছেন “হায় আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমারই, তুমি যা করেছিলে তা ভালোর জন্যই করেছিলে|” কল্পনা করুনতো যে কেউ আপনাকে একটা উপহার দিলো, আপনার তা পছন্দ হলনা এবং আপনার আচরণেই তা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আপনার এই ফালতু উপহার মোটেও পছন্দ হয়নি| আর পরে যখন তা আপনার উপকারে আসলো আপনি তার কাছে গেলেন আর হাত ধরে বললেন, “অনেক অনেক ধন্যবাদ, তোমার উপহারের জন্য আজ বেঁচে গেলাম|”

ইবনে আল-কায়য়িম বলেন, “আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অনেক সাবধানী, কিন্তু তাঁর বান্দা তাঁর সামনে একটুকুও লজ্জ্বা বোধ করেন না|” আল্লাহ হাজার হাজার নবী রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে আমরা সরলপথে তাঁর দিকে চলতে পারি, তিঁনি নিজে প্রতি রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে সর্বনিম্ন আসমানে নেমে এসে জিগ্যেস করেন কেউ কি আছে যে আমার কাছে কিছু চায়? কেউ আছে যে তাওবা করবে? আর তিঁনি তাকে মাফ করে দিবেন| আর এসব কিছুই তিনি করেন শুধু আমাদের জন্য, আমরা না থাকলেও তাঁর কিছু যায় আসে না| আমাদেরই তাঁর কাছে সকল চাহিদা, সকল প্রার্থনা, অথচ তারপরও আমরা তাঁর সকল অনুগ্রহকে উপেক্ষা করতে লজ্জাবোধ করিনা|

আল্লাহতায়ালাকে জানা এবং চেনা:

ইবনে আল-কায়য়িম বলেন যে, তুমি যদি আল্লাহতায়ালকে জানো, তাকে তুমি ভালোবাসে ফেলবেই| যিনি আপনার দূ’আ কবুল করেন, যিনি আপনাকে প্রতিটা কাজের জন্যে পুরস্কৃত করেন, যিনি ক্ষমা করে দেন, যিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখেন, যিনি আমাদেরকে আমাদের মায়ের চাইতেও অধিক ভালোবাবাসেন তাকে কি ভালো না বেসে পারা যায়?

দুজন ব্রিটিশ ব্যক্তি একটা সিংহ শাবককে ছোট থেকে বড় করেন, বড় হয়ে যাবার পর তারা সিংহটিকে লোকালয়ে রাখতে না পেরে তাকে আফ্রিকার বনে রেখে আসে| এক বছর কেটে যাবার পর সিংহটাকে তাদের খুব দেখতে ইচ্ছা হলে তারা আবার সেখানে ফিরে যায়; তাদের কে বলা হয়েছিল যে এতদিন বন্য পরিবেশে থেকে সিংহটা খুব হিংস্র হয়ে গেছে; কিন্তু সুবহান-আল্লাহ(সকল গৌরব, অহংকার ও মহিমা আল্লাহর) অনেক খোঁজাখুজির পেয়ে যখন তারা সিংহটির কাছে গেলো; তখন সে তাদের সাথে কি আচরণ করলো তা না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব না; এমনকি সিংহটি তার সিংহীকেও তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়|

এই সম্পর্ক কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তোলে যে আল্লাহতায়ালার সাথে আমাদের কি রকম সম্পর্ক হওয়া উচিত| প্রতিদিন ঘুমের সময় নিজের রুহকে আল্লাহ তায়ালার কাছে সঁপে দেই আমরা, তিঁনি যদি তা ফিরিয়ে না দিতেন তবে কি আমরা কেউ কিছু করতে পারতাম? প্রতিদিন তিনি আমাদেরকে আলো বাতাস পানি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, প্রতিদিন আমাদের রিজিক এর সুব্যবস্থা করে দিচ্ছেন; আবার যখন সীমালংঘন করছি, পাপ কাজ করছি, তাওবা করার সাথে সাথে মাফ করে দিচ্ছেন| আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? [আর রাহমান ৫৫:৬০]

একটা বন্য ও হিংস্র প্রাণী যদি তাকে কিছুদিনের জন্য দেখভাল করায় এতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে; তাহলে আমাদের আল্লাহতায়ালার প্রতি কি পরিমান কৃতজ্ঞ আর অনুগত হওয়া উচিত? নামাজে ঠিক সেই পরিমান বিনীত হয়ে দাড়ানো উচিত আমাদের| আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। [আল-আম্বিয়া ২১:৯০]

এখন যদি আপনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান, তাহলে আগে ঠিক জায়গায় যোগাযোগ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে, যদি তিনি আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হোন তবেই তার সাথে কথা বলতে পারবেন; এবং এর পরও যদি আপনি তার কাছে কিছু চান তা সে যাই হোক না কেন, তিনি রাজি হতেও পারেন নাও হতে পারেন| যদি আপনার দাবি পূরণ হয় তাহলে আপনি তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ হবেন, সবার কাছে তার সুনাম করে বেড়াবেন|

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ৬

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

অনুগ্রহ

এখন পর্যন্ত আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে নামাজে অবশ্যই আমাদের আবেগ নিয়ে দাড়াতে হবে; আবেগবিহীন নামাজ এখন আমাদের কাছে অতীত হয়ে গেছে| কারণ আমাদের নামাজ এখন আর শুধু নিয়ম মেনে উঠাবসা করাই নয়; বরং নামাজ মানে মহান আল্লাহতায়ালার সামনে দাঁড়ানো, তার সাথে কথা বলা| আর একটি মাত্র বিষয়ে কথা বলে ইনশা-আল্লাহ আগামী পর্ব থেকে আমরা নামাজের ভেতরে প্রবেশ করে প্রতিটা অংশ নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব| যে জিনিসটা নিয়ে আমাদের কথা না বললেই নয় সেটা হল আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদসরূপ দেয়া তাঁর অসংখ্য নিদর্শন সমূহ যা প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে চলেছে| এর কোন ভুমিকা টানার প্রয়োজন নেই| আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

“যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না|” [সুরা ইবরাহীম ১৪:৩৪]

যখনই আমরা এই আয়াত শুনি তখনই এটা আমাদের ভাবিয়ে তোলে আমাদের যা আছে সেসব নিয়ে; আমাদের ঈমান থেকে শুরু করে পরিবার, সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি; এছাড়াও যেসব জিনিস আমরা আমাদের জন্য অবধারিত ছিলো বলে ধরি যেমন কথা বলতে পারার ক্ষমতা, হাটা-চলার ক্ষমতা, দেখতে পাবার ক্ষমতা, শুনতে পাবার ক্ষমতা আরও কত কি| আমরা এসবকে আমাদের নিয়ামত হিসেবে দেখিইনা| এগুলোর আসল গুরুত্ব অনুভূত হয় যখন এগুলোর কোন একটি ছাড়া নিজের জীবন কল্পনা করব তখন; তখন বুঝে আসবে কত বড় নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়ে রেখেছেন অথচ তাঁর প্রতি আমরা কত অকৃতজ্ঞ| আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ [١٤:٣٤]

“যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ|”[সুরা ইবরাহীম ১৪:৩৪]

এখন আমরা আরো দুটি নেয়ামত নিয়ে অল্প কিছু কথা বলবো: ঈমান(এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস) এবং আমান(নিরাপত্তা)|

ঈমান [إيمان]

আমরা খুবই ভাগ্যবান যে, আমরা জানি কে আমাদের পালনকর্তা(রব), এবং এও জানি যে তিনি এক, অদ্বিতীয়| কতো মানুষ তাদের বিধাতাকে তাঁরই বিভিন্ন সৃষ্টির মাঝে তাঁকে খুঁজে বেড়ায়,

কতকিছুর পূজাই না সে করে, তা সে পশুপ্রানিই হোক, মানুষই হোক, কোন বস্তুই হোক অথবা নিজের প্রবৃত্তিই হোক| কিন্তু আমরা জানি, নামাজে আমরা আর কোন কিছুর পূজা করি না, শুধু মাত্র তাঁরই ইবাদত করি এবং সরাসরি তাঁরই কাছে এসে দাড়াই| আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [٢٠:١٤]

আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমারই এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থেই নামায কায়েম কর। [তা-হা ২০:১৪]

আমান [أمن]

দুই ধরনের আমান বা নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলবো আমরা: অভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক| অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি আদর্শ উদাহরণ হল আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা| আমরা এ ব্যাপারে খুব কমই নজর দেই বা খেয়াল করি| আমাদের শ্বেত রক্তকনিকা সব সময় দেহে প্রবেশ করা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দের ধ্বংস করে চলেছে| চলুন দেখে আসি দেহের ভেতরে কি হয়|
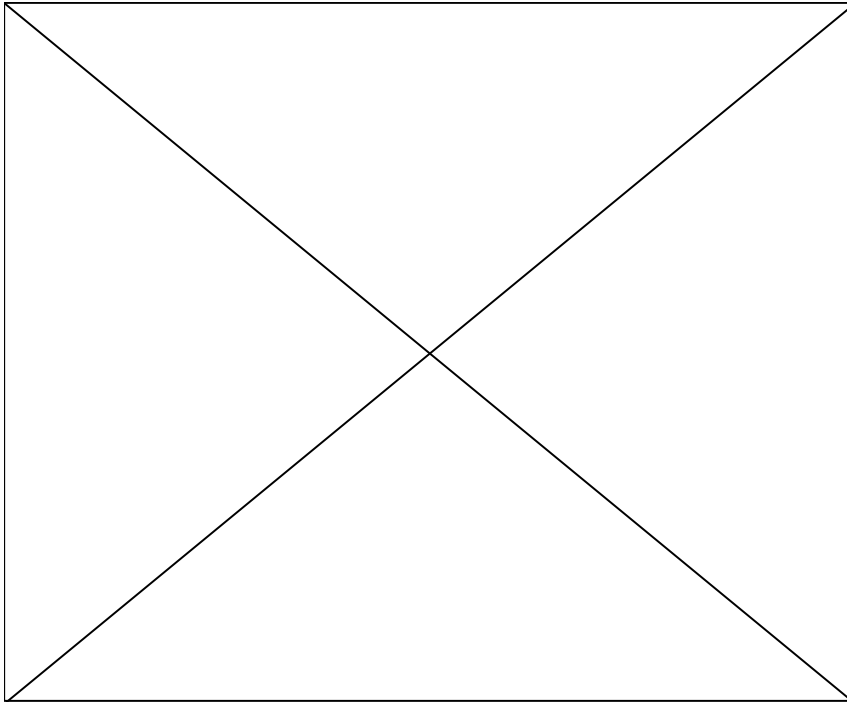
বড় যে সচল কোষটি দেখা যাচ্ছে সেটা হল শ্বেত রক্তকনিকা| গোল গোল প্রায় স্থির গুলো হল লোহিত রক্তকনিকা| আর পিপড়ার মতো কালো ছোট জিনিসটা হল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া| আমাদের

অজান্তেই, আমাদের কোন প্রচেষ্টা ছারাই কিভাবে আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে রাখছে, সত্যিই অসাধারণ|

আর বাহ্যিক নিরাপত্তা? আমাদের কেউ কি আজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠার সময় ভেবেছে যে কেউ হয়তো তাকে হত্যা করবে? অথবা আজ আমার বাসায় ডাকাতি হবে? কেউ ভাবিনি, আমরা খুব নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাই আর ঘুম থেকে উঠি| কল্পনা করুন একবার গাজার(ফিলিস্তিন) কথা, অথবা ইরাকের কথা? যেখানে তারা জানেনা কাল সকালের সূর্য দেখার সৌভাগ্য তাদের হবে কিনা; তারা জানেনা আজ রাতেই তাদের থাকার জায়গায় বিমানহামলা হবে কিনা, জানেনা কখন ঘাতক বুলেট এসে প্রাণ নিয়ে যাবে, তারা জানেনা কবে এই অত্যাচার, এই জুলুম থামবে| যদি বাহ্যিক নিরাপত্তা না থাকতো তাহলে কি হত তা আসলে কল্পনা করে বোঝানো সম্ভব না যদি সত্যিই তাদের জন্য না ভাবেন| আর আল্লাহতায়ালা আমাদের এত নিরাপদে রেখেছেন, এতো আরামে রেখেছেন যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে যাই, মনে করি এসব তো আমাদের প্রাপ্য ছিল|

হায়া [حياء]

এখন আরেকটি আবেগ নিয়ে কথা বলবো, সেটা হল-হায়া, অথবা দুর্বল অনুবাদ হিসেবে বলা যেতে পারে লজ্জাবোধ| নামাজে এই বোধটাকে আমাদের মাঝে নিয়ে আসা উচিত| এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে-আল্লাহতায়ালার কাছে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? এ প্রশ্নের উত্তর হল কারণ আল্লাহ আমাদের উপর ধৈর্যধারণ করে আছেন| আমরা যা করি তারপরও ধৈর্যধারণ করা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব| তিনি আমাদের হাত, পা, চোখ, নাক, মুখ সহ সবকিছু দান করেছেন, কিন্তু আমরা সেসব দিয়েই তাঁর অবাধ্যতা করি, পাপ কাজ করি, সীমালংঘন করি; তারপরও তিনি ধৈর্য ধরেন, সবার সামনে উন্মোচিত না করে আমাদের দোষগুলোকে তিঁনি গোপন রাখেন, আবার তৎক্ষনাত শাস্তিও দেন না| এ সবের পরেও, তিনি আমাদের তাওবা কবুল করেন; শুধু তাইই নয়, তিঁনি তাঁর বান্দার কোন আবদার ফিরিয়ে দিতেও লজ্জা বোধ করেন, যখনই বান্দা তাঁর কাছে কিছু চায় তিনি তা দিয়ে দেন অথবা জান্নাতে তার জন্য আরো বেশী কিছু নির্ধারণ করে রাখেন, যা নবী(সা:) বলে গেছেন| তাহলে আমরা কি লজ্জিত না হয়ে তাঁর সামনে নামাজে দাঁড়াতে পারি?

আল্লাহ আমাদের নামাজ কে নিখুঁত ভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন| আমীন|

[চলবে.... (ইনশা-আল্লাহ)]

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ৭

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

প্রশান্তির প্রতিবন্ধকতা

বিক্ষিপ্ত চিত্ত/মন!

আগের লেখা গুলোর সবই ছিলো ইট-কাঠ-পাথরের দেয়ালে আটকে থাকা আমাদের কঠিন হয়ে পড়া অন্তরগুলোকে সিক্ত করার জন্য- ওগুলোতে মূল নামাজের চেয়ে বেশী গুরত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহতায়ালাকে আরো ভালোভাবে জানার প্রতি, তাঁর প্রতি কি রকম অনুভূতি নিয়ে দাঁড়ানো উচিত- এসব নিয়ে, যাতে করে যখন আমরা নামাজে দাঁড়াই তখন আমরা যেনো এটা জেনে দাঁড়াই যে কোন মহান সত্তার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি| নামাজে আসার আগ মুহুর্তে অবশ্যই আগে যা শিখেছি সেগুলো মনে মনে স্মরণ করতে হবে, যাতে নামাজে আমাদের আর জড়তা না আসে, যাতে নামাজ আমাদের কাছে একটা নতুন মর্যাদা লাভ করে এবং আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে|

এত কিছুর পরও আমাদের বেশির ভাগের নামাজেই বারবার বিঘ্ন ঘটে, মনোযোগ সরে যায় নিজের অজান্তেই| এটা ঠিক যে, আমরা আল্লাহতায়ালাকে ভালবাসি, তাঁকে ভয় পাই, তাঁর করুনা প্রত্যাশা করি কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের মনকে শুধু নামাজের মাঝেই কেন্দ্রীভূত করতে পারিনা| উল্টাপাল্টা চিন্তা হুটহাট করে মাথার ভেতর উদয় হয়: মনে করতে চেষ্টা করি হারিয়ে যাওয়া মোবাইলটা কোথায় রেখেছিলাম, দিবাস্বপ্ন দেখত শুরু করি

যে কিভাবে পৃথিবী থেকে সব সমস্যা দূর করা যায় অথবা আজ রাতে কি দিয়ে ভাত খাবো তা নিয়ে ভাবতে থাকি| আর এ সব কিছুর শুরু হয় যখন আমরা নামাজের জন্য হাত তুলে “আল্লাহ আকবার” বলে নামাজ শুরু করি ঠিক তখন থেকে| আর যখন সালাম ফেরাই তখনই সব চিন্তা হাওয়া হয়ে যায়|

হয়তো একটা জিনিসই আমাদের এসব অযাচিত চিন্তাভাবনা থেকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারে আর তা হল: মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করা যে নামাজে পুরোপুরি একাগ্র না হলে সে নামাজ আমাদের কোনই কাজে আসবে না| কিন্তু আসলেই কি তাই? আমাদের মন সরে গেলে নামাজ কি ভেঙে যায়? না! নামাজ ভাঙ্গবে না, আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু নামাজের সওয়াবের দিক থেকে এটা বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করবে| নবী(সা:) বলেন:

“বান্দা নামাজ আদায় করলে, সেই নামাজের এক-দশমাংশ বা এক-নবমাংশ বা এক-অষ্টমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক সওয়াব পেতে পারে|” [আবু দাউদ, আহমাদ]

কারণ:

ليس للمرء من صلاته إلا ماعقل منها

“বান্দা তার নামাজের শুধু মাত্র সেই অংশের সওয়াব পায়, যে টুকু অংশ সে সজ্ঞানে (বুঝে শুনে) করে|” [আবু দাউদ]

এটা দেখে আবার এ রকম মনে করা উচিত না যে, “থাক তাহলে নামাজ না পড়াই ভালো” অথবা “আমার দ্বারা এরকম নামাজ কখনই হবে না”| ধরুন যে এক পথিক উত্তপ্ত মরুভুমির ভেতর হেটে যেতে যাচ্ছে, চলার এক পর্যায়ে তার একটা স্যান্ডেল ছিড়ে গেলো; তাই সে এক পায়ে স্যান্ডেল

নিয়েই চলতে থাকলো| তারপর একসময় বলে উঠলো, “আমার এক পা তো মরুভুমির উত্তপ্ত বালিতে পুড়ছেই, যাকগে আরেকটা পাও পুড়িয়ে দেই|” আর তারপর সে ছেড়া স্যান্ডেল ঠিক করার চেষ্টা করা বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় আরেকটা স্যান্ডেল খুলে সেই পা টাও পোড়াতে লাগলো| এই ব্যক্তিকে কি বলবেন? নিশ্চিতভাবেই তাকে বোকা বা গাধা বা বলবেন মস্তিস্কবিকৃত মানুষ| এখন আমরা যদি নামাজ ঠিক করার বদলে হাল ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের আর এই ব্যক্তির কোন পার্থক্য থাকলো কি?

একটি গোপন অস্ত্র

অবশেষে প্রথম রহস্য উন্মোচিত করা হবে এখন| এমন কঠিন কিছুই না, কিন্তু এটা খুবই তাড়াতাড়ি আমাদের নামাজের ধরন পাল্টে দেবে| তার আগে একটা প্রশ্ন: বছরের কোন সময় টাতে আমাদের খুশু সবচেয়ে বেশী থাকে? খুবই সহজ উত্তর: রমজান মাসে| আর রমজানের কখন আমাদের খুশু সবচেয়ে বেশী থাকে? সম্ভবত রাতের নামাজের সময়| আর সেই নামাজের কখন সবচেয়ে বেশী মনযোগ থাকে, কখন সবচেয়ে বেশী অশ্রুপাত হয়? যখন আমরা দু’হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি| এই সময়টাতেই আসলে আমরা সেই গোপন অস্ত্রটি ব্যবহার করে থাকি|

কিভাবে? ঐ সময়টাতে আমরা সত্যিই আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে থাকি, তাঁর কাছে দাবি নিয়ে চাইতে থাকি এবং তাঁর সাড়া পাবার আশা করতে থাকি| আর এই অনুভুতিটাই আমাদের মন ও অন্তরকে নামাজের ভেতরে মগ্ন করে ফেলে, আমরা নামাজের মাধূর্য অনুভব করতে থাকি|

তাহলে গোপন জিনিসটি কি? তিন বাক্যে বলা যেতে পারে:

১. আল্লাহর সাথে কথা বলা

২. আল্লাহকে তার বিভিন্ন নাম(নামের অর্থ বুঝে সেই গুণটির মূল্য বুঝে) ধরে ডাকা

৩. তাঁর কাছ থেকে পাবই এমন দাবি নিয়ে চাওয়া, কথোপকথন চালানো|

নবী(সা:) বলেন:

إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه

“নামাজের সময় বান্দা তাঁর রবের সাথে খুব আপনভাবে কথা বলে” [বুখারী, মুসলিম]

ইবনে উথায়মান বলেন যে যখন কেউ নামাজে প্রবেশ করে, তার এমন অনুভব করা উচিত যেন সে তাঁর রবের আরশের পাশে অবস্থান করছে এবং তাঁর সাথে কথা বলছে।

সমস্যা হল আমরা আমাদের নামাজে আল্লাহর সাথে যোগাযোগটাকে অনুভব করতে পারি না; আমাদের মনে হয় যে আমরা শুধু বলেই যাচ্ছি কোন উত্তরতো পাচ্ছি না, একপেশে সংলাপ বলে মনে হয়। আসলে আমরা যখন বলি "আলহামদুলিল্লাহি রব আল-আ'লামীন" আমাদের এইটা ভেতর থেকে অনুভব করতে হবে যে সত্যিই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সারা বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর। সেজদাহর সময় আমদের মনে এই অনুভূতি থাকতে হবে যে "ইয়া আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে দিও না, তুমি ছাড়া আমারতো কেউ নেই, আমাকে তোমার দুয়ার হতে ফিরিয়ে দিওনা।" শুধু মন্ত্র পাঠ করার মতো বারবার তাসবিহ পড়ে কোন লাভ নেই, যা বলবেন অর্থ বুঝে, বিশ্বাস করে, নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে বলবেন। যদি এমনটা করতে পারেন তাহলে সব নামাজই রমজানের রাতের ক্রন্দনরত নামাজের মতো হবে।

আমরা যখন সেজদাহবনত থাকি, তখন আমাদের সবাই মুখস্ত করা তাসবিহ পড়ে থাকি। কিন্তু একজন অত্যন্ত পুন্যবান পূর্বসুরী এই সেজদাহবনত অবস্থার মূল্য জানতেন এবং দু'আর সাথে সাথে আল্লাহ কে বলতেন "ইয়া আল্লাহ, তোমার এই বান্দা(সে নিজেই) কি জান্নাতে না জাহান্নামে?" কতটা ঘনিষ্ঠতা খেয়াল করুন-তিনি জানতেন তিনি আল্লাহর খুব কাছে অবস্থান করছেন এবং এত মগ্নভাবে সেজদাহবনত ছিলেন যে তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছেন।

শুধু পড়ার জন্য পড়া নয়

এই লেখা গুলো পড়া আর মাথা ঝাকানো খুব সোজা, দু'একটা জিনিস শিখলেন আর বললেন "ওহ এগুলোতো জানিই।" শুধু জেনে কোন লাভ নেই, যেটুকু জানলাম সেটুকু প্রয়োগ করা শুরু করি। চলুন সবাই মিলে একে অপরকে সাহায্য করে এই অল্প অল্প জ্ঞানগুলোকে প্রয়োগ শুরু করি:

১. এমন একজন বন্ধুকে সাথে নিন যার সাথে আপনি ইসলামের ব্যাপারে অনেক খোলামেলা। প্রত্যেক নামাজে আসার সময় একজন আরেকজনকে মনে করিয়ে দিন যে এখন আল্লাহর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। আল্লাহর গুনাবলী নিয়ে কথা বলুন, যেসকল কারণে তাঁর প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ সেসব নিয়ে কথা বলুন, কথা বলুন কি কি কারণে আপনি তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করেন সে সব নিয়ে।

২. যখন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে হাত তুলবেন "আল্লাহ আকবার" বলার জন্য, তা করবেন দৃঢ় প্রত্যয়ে, নিজেকে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে। মনে করবেন যেন আপনাকে এখন পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে, আপনার রুহকে তাঁর রবের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর এখনই আপনার সাথে আপনার

রবের ঘনিষ্ঠ কথপোকথন শুরু হবে| এই জগতের আর কোন কিছুতেই আপনার আর মনোযোগ সরাতে পারবে না|

আল্লাহতায়ালা যেনো আমাদের নামাজকে নবী(সা:), তাঁর সাহাবাগণ(রা:) এবং তাদের যোগ্য উত্তরসূরীদের নামাজের মতো মাধুর্যময় করে তোলেন| আমীন|

[চলবে.... (ইনশা-আল্লাহ)]

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ৮

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

নামাজের পূর্বেই নামাজের অবস্থায়:

যখন আমরা “সালাত”এর কথা বলে থাকি, আমরা সবাই মনে করি যে এটা আসলে শুরু হয় যখন আমরা দাঁড়িয়ে হাত তুলি এবং বলি “আল্লাহ আকবার”| কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়, এটা “আল্লাহ আকবার” বলারও আগে থেকে শুরু হয়| নবী(সা:) বলেন:

لا زال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

“একজন যতক্ষণ নামাজের জন্যে অপেক্ষায় থাকে, তার জন্যে ঐ সম্পূর্ণ সময় নামাজের মধ্যে ধরা হয়|”(বুখারী, মুসলিম)

পুরুষদের জন্যে, এটা সেই সময় থেকে শুরু হয় যখন সে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে মসজিদে জামাতের সাথে নামাজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে| যারা মসজিদে অবস্থান করছেন না এমন মহিলাদের জন্য এই নামাজের সময় শুরু হয় যখন তিনি অজু করে নামাজের জন্য সঠিক পোশাক(যদি তাঁর দরকার হয়) পরে নামাজের সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন তখন থেকে|

একটি গুপ্তধন:

শয়তান নামাজকে ঘৃনা করে| নবী(সা:) বলেন, “যখন আজানের শব্দ উচ্চারিত হয়, শয়তান তখন সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালিয়ে যায় যাতে তার কানে আর আজানের শব্দ না আসে| আজান শেষ হলে আবার ফিরে আসে; ইকামাতের সময় আবার সে পালিয়ে যায় এবং শেষ হলে আবার ফিরে আসে, এবং মানুষের মনকে ফিসফিসিয়ে ধোঁকা দিতে থাকে(যাতে নামাজ থেকে মনোযোগ সরে যায়) এবং মানুষকে এমন সব জিনিস মনে করিয়ে দেয় যা নামাজের পূর্বে তার মাথায় ছিলনা এবং যার কারণে মানুষ ভুলে যায় যে সে কতো রাকাত নামাজ পরেছে|” [বুখারী] নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ন দিক যেটাকে আমরা আমলেই নেই না সেটা হল আজান| আমরা কি কখনো আজানের সুমধুর সুর-মূর্ছনা অনুভব করেছি? যে আজানের মাধুর্য আস্বাদন করে তার নামাজের খুশু বৃদ্ধি পায়| প্রশ্ন আসতে পারে যে খুশুর সাথে আজানের সম্পর্ক কি?

আজানের সময় হতেই শয়তান মানুষের মনকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে থাকে, যাতে আজানের গুনাবলী থেকে সে কোন লাভ না পায়| তাহলে আজানের কি এমন বিশেষ গুন আছে?

আজান: একটি সুযোগ
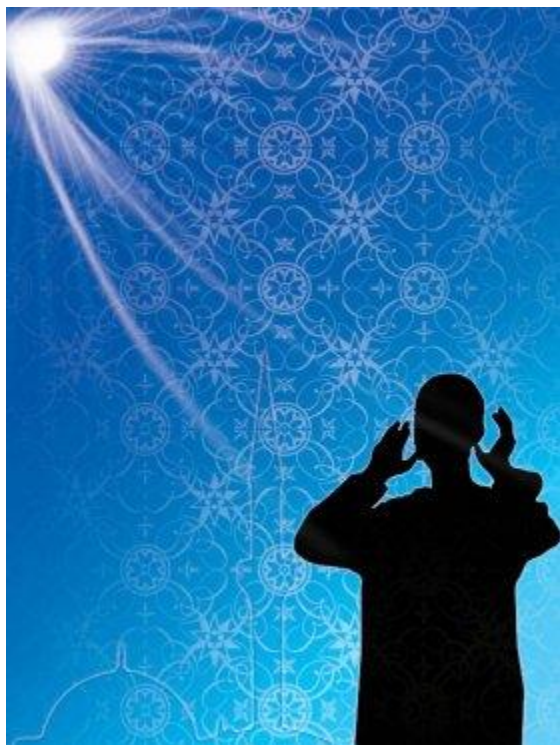
নবী(সা:) বলেন:

المؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه

"মুয়াজ্জিন (যিনি আজান দেন)কে তার আজান যতদুর পৌঁছে এবং যে তা শুনে আজানের শব্দ গুলোর সমর্থন দেয়(আজানের উত্তর) তার জন্য মাফ করে দেয়া হয়| যারা তার সাথে নামাজ পড়বে, তাকেও তাদের সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে|"

তাহলে যদি ৫০ জন মানুষ নামাজ পড়ে, মুয়াজ্জিন ৫০ জনের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে| যদি ১০০ জন নামাজ পড়ে তো ১০০ জনের সওয়াব পাবে| আমাদের প্রশ্ন হল: আমরা তো মুয়াজ্জিন না, আমাদের এতে কি লাভ আছে? হ্যাঁ, লাভ আছে, আমরাও মুয়াজ্জিনের সমপরিমাণ সওয়াব পেতে পারি| আবদুল্লাহ বিন আমর(রা:) বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি নবী(সা:)কে জিগ্যেস করেন "মুয়াজ্জিন কি আমাদের চেয়ে বেশী সওয়াব পান?" এবং নবী(সা:) উত্তরে বলেন:

قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه

“মুয়াজ্জিন যা বলে তা তুমিও বল আর যখন আজান শেষ হয়, তখন দোয়া করো, তাহলে তোমাকেও সে সওয়াব দেয়া হবে|”[আবু দাউদ]

যখন আজান “আল্লাহ আকবার” বলার মাধ্যমে শুরু হয় তখন, এটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে, আপনি যাই করছেন আল্লাহতায়ালা তার চেয়ে অনেক গুরত্বপুর্ন, তা সে টিভিতে কোন সিরিয়ালই হোক, অথবা নেটে বা পেপারে পড়া কোন লেখনী হোক আর কোন কথপোকথনই হোক| আর কেন আজান দেয়ার সাথে সাথে সবকিছু ছেড়ে নামাজের প্রস্তুতি নেবেন? কারণ-“লা-ইলাহা ইলা-আল্লাহ”-আপনি এক আল্লাহই বিশ্বাস করেন| যদি আজান আপনাকে আপনি যা করছেন তা থেকে সরিয়ে নামাজমুখী করতে না পারে তার মানে হল আপনি আল্লাহর চেয়ে এই কাজকে বেশী গুরুত্বপূর্ন মনে করছেন|

আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই

আমরা জানি যখন আমরা আজান শুনি তখন আমাদের উচিত মুয়াজ্জিন যা বলে তা নিজে নিজে বলা| এটাই আজানের উত্তর| তবে “হায়া’আলা আস-সালাহ” (নামাজের জন্যে আসো) এবং “হায়া’আলা আল-ফালাহ” (সাফল্যের দিকে এসো) এই দুটোর উত্তরে বলতে হয় “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ” (আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কারও কোনই ক্ষমতা নেই)|

এটা কেন বলি? আসলে এটা হল আল্লাহর কাছে আমাদের অসহায় আত্মসমর্পণ যে আল্লাহ তোমার সাহায্য ছাড়া নামাজে নিবিড় ভাবে মগ্ন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, নামাজ সঠিকভাবে আদায় করাও সম্ভব না|

একটি আহ্বান

মনে রাখা উচিত যে আজান হল আহ্বান; এটা হল সবচেয়ে সুন্দর আহ্বান যা আমাদেরকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য আল্লাহর দিকে ডাকে| যখন আমরা আমাদের অনেক ভালোবাসার কারও কাছে যাই আমাদের মাঝে আবেগ-উত্তেজনা কাজ করে, এক ধরনের আকাঙ্খা কাজ করে| আর এসবই শুরু হয় যখন অনেক ভালোবাসার সে বলে “দশ মিনিটের মাঝেই আমি তোমার সাথে দেখা

করছি” বা “তুমি আসো এখনই দেখা করবো”| আমাদের মাঝে এক আজব সুখের অনুভূতি খেলা করে| আয়েশা(রা:) বর্ণনা করেন নবী(সা:) বলেছেন:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

“যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন|” (বুখারী)

আজান আমাদের বলে যে এখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় হয়েছে| তাই যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তারা তারাতারি করে প্রস্তুত হয়ে দেখা করতে মসজিদে বা জায়নামাজে দাড়িয়ে পড়ে, নামাজের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করে না| মুসা(আ:) কে দেখুন কি করেছিলেন:

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ

“(আল্লাহ বললেন)হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? তিনি(মুসা(আ:)) বললেনঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও|” [সুরা তাহা ২০:৮৩-৮৪]

মুসা(আ:) আল্লাহকে প্রচন্ড ভালবাসতেন, এ কারণেই তারাতারি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশায় এত জোর কদমে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তার সম্প্রদায় তাল মেলাতে না পেরে পিছিয়ে পরেছিলো|

আজান কে উপভোগ এবং উপলব্ধি করতে থাকুন, ইনশা-আল্লাহ নামাজও উপভোগ্য হয়ে উঠবে| ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের নামাজ কে নিঁখুত ও সুন্দর করে তুলুন| আমীন|

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ৯

রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

বিশ্বাসের মাধুর্যঃ

একটি প্রশ্ন: মনে করুন আপনি একজন অপরাধী, এবং আপনার অসংখ্য অপরাধের জন্য একজন বাদশাহ আপনাকে ৫০ বছরের কারাদন্ড দেবে। এবং আপনাকে বলা হল সেই ৫০ বছরের কারা ভোগের পর তিনি আপনাকে একটা প্রশ্ন করবেন। আপনি যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন, আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে। যদি সঠিক উত্তর দিতে না পারেন আপনাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হবে। আপনাকে যখন সেই কারাগারে নেওয়া হবে, ৫০ বছর আপনি কি নিয়ে চিন্তা করবেন? আপনি কি এটা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবতে পারবেন যে - কি হতে পারে সেই প্রশ্ন?
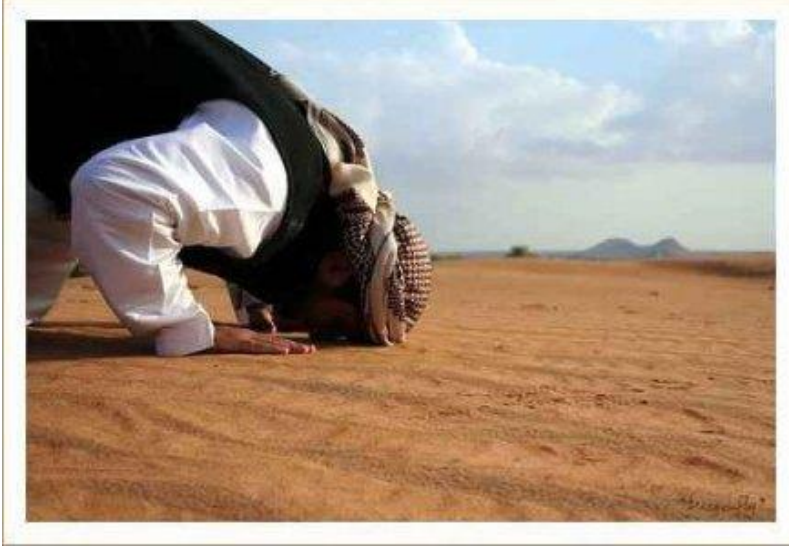
এখন আরও একটু কল্পনা করুন যে, সেই কারাগারে আপনার সাথে আরও একজন বন্দি আছে যে বলল, আমি জানি বাদশাহ তোমাকে ঠিক কি প্রশ্নটি করবেন। আপনার তখন কেমন বোধ হবে? আপনি সেই প্রশ্নটি জানার জন্য আকুল হয়ে যাবেন। এবং জানার সাথে সাথে সঠিক উত্তরটি দেওয়ার জন্য যথা সাধ্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবেন।

বাস্তবে আমরা প্রত্যেকেই সেই কারাবন্দি মানুষ। কেয়ামত দিবসে সেই একটি বিশেষ প্রশ্ন আমাদের করা হবে, যার উত্তর আমরা যদি ঠিক মত দিতে পারি, তবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায়, পরবর্তী সব কিছু সহজ হবে। আর যদি না দিতে পারি তবে তার পরিনতি ভয়াবহ। আজকে এখানে সেই প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করা হবে যেটি জানার জন্য আমরা সবাই অধীর হয়ে আছি। এটি আমার কথা নয়, এটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কথা -

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هي الصلاة. فإن صلحت، صلح سائر عمله. وإن فسدت، فسد سائر عمله

আল্লাহর বান্দার কাছ থেকে কিয়ামাত দিবসে যে বিষয়টির হিসাব সবার প্রথমে নেওয়া হবে তা

হল নামাজ। এই হিসাব যদি সন্তোষজনক হয় তাহলে তার পরবর্তী কাজ গুলো সহজ হবে। আর যদি তা অসন্তোষজনক হয় তাহলে তার পরবর্তী হিসাব হবে কঠিন।(তিরমিজী, বায়হাকি, নাসায়ী)

আমরা হব পরবর্তীতে উল্লেখিত পাঁচ ধরনের মধ্যে যে কোন এক ধরনের ব্যক্তি যে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হব। আমরা তাহলে কোন ধরনের হতে চাই?

মসজিদে খুশু নিয়ে নামাজ আদায়কারী

প্রথম ধরনের ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি যে মযজিদে যায় এবং খুশু সহকারে জামাতে নামাজ আদায় করে অথবা সেই মহিলা যে আজান শেষ হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামায আদায়ের জন্য খুশু নিয়ে দাঁড়ায়। এটি হল সর্বোত্তম অবস্থা এবং আপনি যদি এই অবস্থায় ইতিমধ্যে থেকে থাকেন তাহলে তা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে রাখুন। আল্লাহ বলেন -

الذين هم على صلاتهم يحافظون أُولائِكَ فِى جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ

এবং সর্বোপরি যারা নিজেদের নামায হেফাজত করে, পরকালে এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে। (সুরা আল মারিজ ৩৪-৩৫)

আল্লাহ এদের ব্যাপারে আরও বলেন-

أولائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

এ লোকগুলোই হচ্ছে মুলত জমিনে আমার যথার্থ উত্তরাধিকারী, জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারও এরা পাবে, এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সুরা আল মুমিনুন ১০-১১)

ফিরদাউস হল জান্নাতের সর্বউচ্চ স্তর।

মসজিদে নামায আদায়কারী কিন্তু খুশুর অভাব

এই ধরনের ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার জন্য পুরস্কৃত হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন-

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

জামাতে নামায আদায়কারী একা নামায আদায়কারির চেয়ে ২৭ গুন বেশি সওয়াব পাবে।

তারপরও, খুশু না থাকা কোন হেলাফেলার বিষয় না। উমর (রাঃ) একদিন মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে বলেন -

এমনও আছে কোন লোক ইসলামের পথে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে গেল অথচ সে একটি নামাজের জন্য ও পুরস্কৃত হলনা।

তখন তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হল।
তিনি উত্তরে বললেন - খুশুর অভাবে।

নামাজে পরিপূর্ণ খুশুর একটি উদাহরন দেখুন। একদিন সকালে আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলেন। তিনি তাকে নামাজে একটি আয়াত পরতে দেখেলন -

فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم

‘আর এ কারনেই আজ আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর এ সব নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সর্বোপরি তিনি আমাদের জাহান্নামের গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন।’ (সুরা আত তূরঃ২৭)

উনি যখন এই আয়াতটি পড়ছিলেন, উনি কাঁদছিলেন এবং উনি আবার এই আয়াতটি পড়ছিলেন। এরকম তিনি এতবার করছিলেন যে আল কাসিম (রাঃ) বিরক্ত হয়ে বাজারে উনার দরকারি জিনিস কিনতে চলে গেলেন। সে যখন ফিরে আসলেন, দেখলেন আয়েশা (রাঃ) একই জায়গায় দাড়িয়ে তখনও সেই একই আয়াত পড়ছেন আর কাঁদছেন।

মুসলিম বিন ইয়াসার ও নামাজের নিষ্ঠার এমন আরেকটি উদাহরন। একদিন মসজিদের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে সেখানে ছুটে আসলো কারন তারা জানত উনি এখানে নামায পড়ছিলেন। উনাকে সেখানে তখনও একভাবে নামাজে মগ্ন অবস্থায় দাড়িয়ে থাকতে পাওয়া গেল।

ঘরে নামায আদায়কারী

ঘরে নামায পড়া আর মসজিদে নামায পড়ার তফাত কি? প্রথমে আমাদের জানতে হবে মসজিদে নামায পড়ার বৈশিষ্ট কি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন-

إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

যখন ইমাম নামাজে আমীন বলেন, তোমরাও একই সাথে আমীন বলবে। যদি এটি ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তবে তোমাদের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে (বুখারি)।

সাইয়িদ আল মুসায়িব বলেন- ৪০ বছরে এমন কখনও হয়নি, মুয়াজ্জিন আজান দিয়েছে অথচ আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম না।

আরেকটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করছি। উবায়দাল্লাহ বিন উমার আল কাওারিরি বলেন-

আমি কখনও মসজিদের ঈশার জামাত ছাড়তাম না। একদিন, আমার কাছে এক মেহমান আসলে তার সাথে কথায় কথায় সময় কেটে যায়। হটাৎ খেয়াল হল ঈশার জামাতের সময় তো চলে গেল। আমি বসরার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এমন মসজিদ খুজতে লাগলাম যেখানে তখনও জামাত শুরু হয়ে যায়নি। কিন্তু এমন একটি মসজিদ ও পেলাম না। রাসুল (সাঃ) এর সেই কথাটি ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলাম যে উনি বলেছেন একাকি নামাজের চেয়ে জামাতে নামায ২৭ গুন উত্তম। তখন আমি ঘরে ২৭ বার নামায পরলাম। ওই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি ঘোড়ার পিঠে একদল লোকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করছি কিন্তু কিছুতেই তাদের ধরতে পারছিনা। তখন তাদের একজন বলল, তুমি কিছুতেই আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। যখন আমি জিজ্ঞেশ করলাম -কেন, সে বলল কারন আমরা একত্রে নামজ পড়েছি, তুমি পড়নি। আমি অত্যন্ত কষ্ট নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম।

দেরীতে নামায আদায়কারী

আমরা যদি জানি যে আমাদের বিকাল ৪ টায় ফ্লাইট আছে, আমরা কি ৫ টায় পৌঁছব? না, কারন এখানে অনেক কিছু জড়িত, আমরা টাকা খরচ করে টিকেট কিনেছি, কেউ হয়ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, অথবা আমাদের ছুটি দরকার। এই সমস্ত কিছুর চেয়েও নামায অনেক বেশি জরুরি। তাহলে আমরা কিভাবে ফজরের নামায কাজা করতে পারি আর তা বেলা ১০ টায় আদায় করতে পারি? অথবা জোহর ও আসর একত্রে পড়তে পারি? অথবা মাগরিব নামায পড়তে ঈশার আজান পর্যন্ত দেরি করতে পারি?

আহমেদ বর্ণিত হাদিসে আছে,

من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيِّ بن خلف

যে সবসময় সময় মত নামায আদায় করা চালিয়ে যায়, কিয়ামাতের দিন এই নামায তার জন্য হয়ে যাবে নুর, সাক্ষী এবং গুনাহ মাফের কারন। নতুবা তাকে দাড় করান হবে ফারাও, কারুন, হামান আর উবাই ইবনে খালাল এর সাথে।

যে নামায আদায় করে না

নামায পড়তে কতক্ষণ সময় প্রয়োজন? ৫ মিনিট? অথবা খুশু নিয়ে পড়লে ১০ মিনিট? তারপরও সারাদিন আল্লাহর জন্য এই মাত্র ৫০ মিনিট আমাদের কাছে অনেক বেশী মনে হয়। এই হাদিসটি শুনুন-

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

একজন মানুষ ও একজন কাফিরের মধ্যে পার্থক্য কারী জিনিস হল নামায।(মুসলিম, হাদিস-১৪৭)

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আপনি কোন প্রকারের মানুষের দলে পড়ছেন? আল্লাহ আমাদের সবাই কে যেন সেই প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।

চলবে......

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১০

রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

ওযু
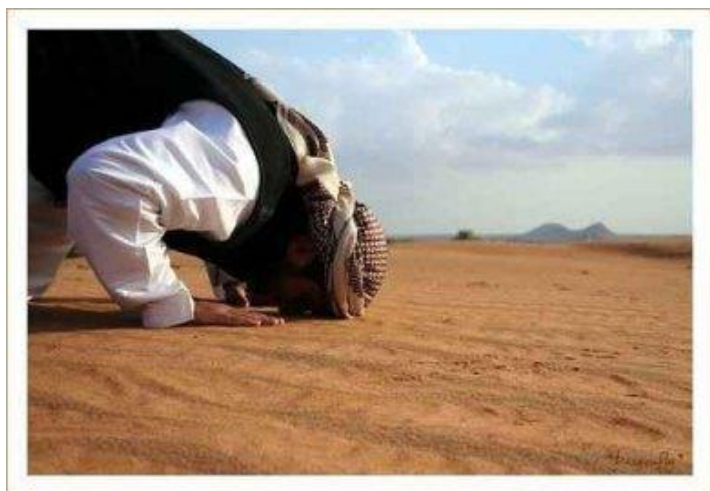
আমরা সবাই জানি, যথাযথ ভাবে ওযু করা নামাজের একটি পূর্বশর্ত। এ কারনে আমরা ওযুকে কেবল নামাজে দাঁড়ানোর আগের একটি প্রয়োজনীয় কাজ মনে করি। আমরা ভাবি, ঠিকভাবে ওযু না হলে নামাজে দাড়াতে পারব না, তাই আমরা এই নিয়তেই ওযু করি। কিন্তু ওযুর মহত্ত্ব এর চেয়ে

অনেক বেশি। এটা দুঃখজনক যে আমরা ওযু থেকে কোনরকম উজ্জীবিত না হয়েই এতো বছর নামায পড়ে চলছি। ওযুর মধ্যেও কিছু গুপ্তধন আছে। কিন্তু এই গুপ্তধনের স্বাদ আস্বাদন করতে আগে আমাদের নিজেদেরকে একটু পরিবর্তন করতে হবে।

নিয়ত

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক বলেছেন, "এমন কত কাজ আছে যা ছোট মনে করে করা হলেও তা হয় বেশি সম্মানিত; আবার এমন কত কাজ আছে যা অনেক বড় মনে করে করা হলেও তা হয়ে যায় সামান্য; নিয়তের কারনে।"

প্রথমে আমরা ওযুতে যে পরিবর্তন আনতে পারি তা হল এ থেকে প্রাপ্ত সওয়াবের পরিমান। কেউ কেউ বলতে পারে - 'আমি তো ওযুর সমস্ত সুন্নাত পালন করি, পানির অপচয় করি না, শুরুতে শেষে দোয়া করি।' তাহলে আর কিভাবে সওয়াব এর পরিমান বাড়ানো যাবে? লক্ষ্য করলে দেখবেন, ওযুতে আমরা যা যা করছি তা হল বাহ্যিক। যা বাকি রয়ে গেল তা হল - অন্তর। ইবনে আল কায়্যিম বলেছেন, যে বেক্তি অল্প আমল করল সে আল্লাহর নিকট বেশি আমলকারীর চেয়ে প্রিয় হতে পারে, যদি অল্প আমলকারীর অন্তর তার আমলে যুক্ত থাকে। এটা বোঝাতে তিনি একটি গল্প বর্ণনা করেন- এক লোক দেখল শয়তান মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে আছে, ভেতরে ঢুকতে পারছে না। লোকটি ভেতরে তাকিয়ে দেখল, একজন লোক শুয়ে আছে আরেকজন দাড়িয়ে নামায পড়ছে। তখন সে শয়তান কে জিজ্ঞেস করল, যে লোকটি নামায পড়ছে তার কারনে কি তুমি মসজিদে ঢুকতে পারছনা? শয়তান উত্তর দিল- যে লোকটি শুয়ে আছে তার কারনে। কেন? তার মনের অবস্থার কারনে।

নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি যখন ওযু করছেন আপনার মনের উদ্দেশ্য বা নিয়ত টি কি? আমরা বেশির ভাগ বলব নিজেকে নামাজের জন্য প্রস্তুত করা। কিন্তু আমাদের অন্তর কে এখানে আরেকটু গভীরে প্রবেশ করাতে হবে এবং আরেকটি উদ্দেশ্য যোগ করতে হবে- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা অনেকটা কিছু দান করার মত। আপনি যখন বাড়ি ফেরার পথে ভিখারিকে কিছু টাকা দিলেন, আপনি হয়ত তা নিয়ে আর তেমন কোন চিন্তা ই করবেন না। কিন্তু যখন আপনি এই নিয়তে টাকাটা দিবেন, যে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন অভাবীকে সাহায্য করছেন, তখন আপনার মনে অন্যরকম এক অনুভূতি আসবে, আপনি আরও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। আপনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার আরও নিকটে বোধ করবেন, তা ৫ টাকা দিয়েই হোক অথবা ৫০ টাকা।

আরেকটি উদ্দেশ্য যোগ করুন, সেটি হল আমাদের প্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সুন্নাহর অনুসরণ। আমাদের আরও নিখুঁতভাবে ওযু করার আগ্রহ জাগবে যখন আমরা চিন্তা করব আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কিভাবে ওযু করতেন। আমার মনে পড়ছে তখনকার কথা যখন আমি আমাদের

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসরণের উদ্দেশ্যে ছোট একটি পাত্রে ওযুর পানি নেই, এটি আসলেই আমাকে আরও উদ্দিপ্ত করে এবং আমি বুঝতে পারি ওযু করতে আমাদের কতই না অল্প পানির প্রয়োজন হয়।

পরিশেষে আমরা আরেকটি মাত্রা যুক্ত করতে পারি যাতে ওযুর ব্যাপারে আমরা আন্তরিক হতে পারি এবং একে আল্লাহর কাছে পছন্দনীও করতে পারি। তা হল- আমাদের কিছু গুনাহ মুছে ফেলার নিয়ত। ওযু হল পবিত্রতা আনয়নকারী কারন এটি আমাদের ছোট গুনাহ গুলকে ধুয়ে ফেলে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন - ‘যে বেক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে তার শরীরের গুনাহগুলি ধুয়ে যাবে, এমনকি তার আঙ্গুলের নখের নীচ থেকেও।’ (মুসলিম)

ওয়াসওয়াসা

অনেকে নিখুঁতভাবে তাদের ওযু এবং নামায করার সময় এক কঠিন সমস্যার মুখমুখি হয়- ওয়াসওয়াসা; যা একধরনের মনের ফিসফিসানি, এখানে এটি একধরনের সন্দেহবাতিক বোঝায়। উদাহরনস্বরূপ, এমন বেক্তি যে নিখুঁত করার জন্য সন্দেহবশতঃ একাধিকবার ওযু করে এবং ঠিক হল কি হল না এই সন্দেহে একাধিক বার নামায ও পড়তে চায়।

আপনার যদি এই সমস্যা থেকে থাকে তাহলে তার সমাধান ও আছে ইনশাল্লাহ। অনেকে এটি প্রয়োগ করেছেন এবং বলেছেন তারা আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করেছেন। আলেমরা বলেন, যারা এরকম তীব্র সন্দেহে ভগেন তারা যেন তাদের কাজগুলোর ব্যাপারে উত্তমটাই ধরে নেয়। যেমন কারো যদি সন্দেহ হয় আমার ওযু আছে কি নেই, তবে যেন তারা ধরে নেয় তাদের ওযু আছে। যদি কারো মনে হয় আমি কি তিন রাকাত পরলাম না চার রাকাত, সে যেন চার রাকাত ধরে নেয়। কেউ কেউ এতে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আসুন তাহলে এ ব্যাপারে মনে জাগা কিছু প্রশ্নের উত্তর জেনে নেই। প্রথমত, আমরা কেন বারবার ওযু করব? আমাদের ভয় আমরা ঠিক মত ওযু করিনি বা আমাদের ওযু নেই এবং আল্লাহ হয়ত তা কবুল করবেন না। যেহেতু আপনি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করছেন, জেনে রাখুন- আল্লাহ চান না আপনি বারংবার ওযু করবেন। কিভাবে বুঝবেন? মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

“কেউ যদি পেটের অস্বস্তিতে ভোগে এবং নিশ্চিত হতে না পারে যে সে বায়ু ত্যাগ করেছে কিনা, সে যেন মসজিদ ত্যাগ না করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শব্দ বা গন্ধ পায়।”(মুসলিম)

এভাবে সে যেন ১০০% নিশ্চিত হয়।

ওযুর পরের কিছু দোয়া

কিছু দোয়া আছে যা ওযুর করে পড়া উচিত।

“আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহি ওয়া রাসুলুহ”

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।)

তাহলে তাঁর জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোন দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।(মুসলিম)

আবার,

“সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক”

এটি তাঁর জন্য শ্রেষ্ঠতম কাগজে লিপিবদ্ধ করে সীলমোহর দিয়ে বন্ধ করে রাখা হবে, যা কেয়ামত দিবসের আগে খোলা হবে না।(সহিহ আল জামিই)

আল্লাহ আমাদের হৃদয় দিয়ে ওযু করার তৌফিক দিন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ১১
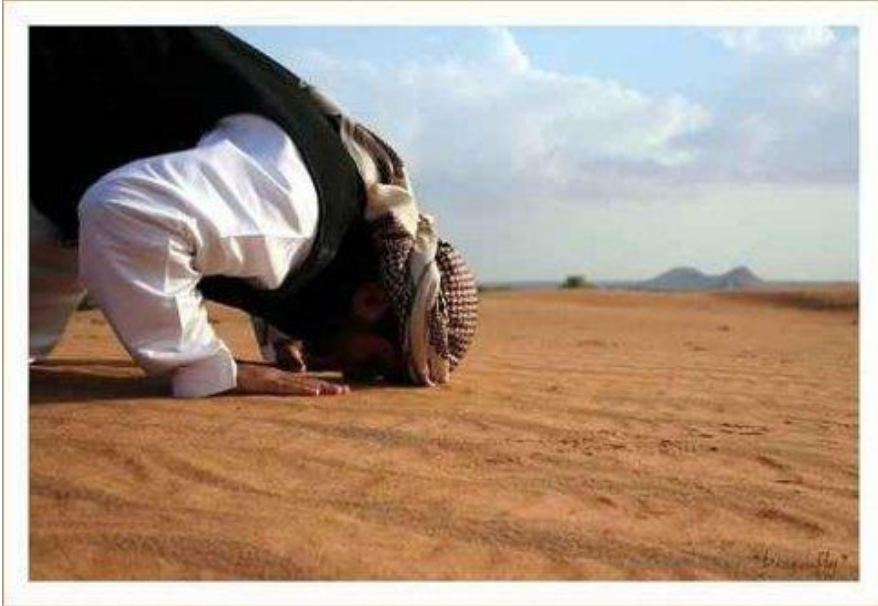
রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

ওযু করে আমরা বাহ্যিক পবিত্রতা লাভ করি যাতে আমরা নামাজ পড়তে পারি। এখন বাহ্যিক পবিত্রতা লাভের পর আমাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আর এই ওযুর মাধ্যমে সেটিও সম্ভব। ইবনে আল কাইয়িম বলেন-

اذا لقي العبد ربه يوم القيامة قبل الطهر التام فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه كما أنه لا يؤذن له ان يدخل على ريه للصلاة الا بطهارة

'কিয়ামাতের দিন বান্দা যদি সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র না হয়ে (গুনাহ থেকে) আল্লাহর সামনে হাজির হয়, তবে যেমন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না, ঠিক তেমনি নামাজেও বান্দা পবিত্র না হয়ে তার রবের সামনে দাড়াতে পারবে না।'

আমরা ওযুর পরে পড়ার একটি দোয়া বিবেচনা করে দেখি -

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

"হে আল্লাহ, আমাকে সর্বদা তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও" (তিরমিযি)

কাজেই, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে সাজানোর আগে নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র করতে হবে। এভাবে চিন্তা করে দেখুন, কোন জামা গায়ে দেওয়ার আগে সেটাকে কি ধুয়ে তারপর সুগন্ধি লাগাবেন, নাকি আগে সুগন্ধি লাগিয়ে পরে ধোবেন? নিশ্চয়ই আগে ধুয়ে পরে সুগন্ধি লাগাবেন।

উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করিম (সাঃ) বলেনঃ

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে তার শরীরের গুনাহগুলি ধুয়ে যাবে, এমনকি তার আঙ্গুলের নখের নীচ থেকেও।’ (মুসলিম)

এবং আবু হুরায়রার বর্ণনায় বলা হয়, পানির শেষ ফোঁটার সাথে গুনাহ ধুয়ে যায়।

সুবহানআল্লাহ, ওযু কেমন ভাবে গুনাহ পরিষ্কার করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করে দেয়। উসমান বিন আফফান (রাঃ) এর বর্ণনায়-

إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك

যখন কোন বান্দা ওযুর সময় তার মুখ ধোয়, সে মুখ দিয়ে যত গুনাহ করেছিল তা ধুয়ে যায়; যখন সে তার হাত ধোয়, একই জিনিস ঘটে; যখন সে তার মাথা ধোয়, একই জিনিস ঘটে এবং যখন সে তার পা ধোয়, তখনও একই জিনিস ঘটে। (আহমাদ)

কাজেই কল্পনা করুন, আমরা চোখ দিয়ে যে গুনাহ করি তা ধুয়ে যাবে, কান দিয়ে যে গুনাহ করি তা ধুয়ে যাবে এবং অন্যান্য অঙ্গের বেলায় ও তাই হতে থাকবে। অতএব, এখন থেকে আমরা যখন ওযু করব আমরা কল্পনা করব আমরা এই গুনাহ গুলি কে ঝরে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এবং সবসময় বিশ্বাস রাখব আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

আবু হুরায়রা আরও বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাঃ) বলেন -

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط

فذلكم الرباط فذلكم الرباط

আমি কি তোমাদের ওই বিষয়ে বলবনা যা দিয়ে আল্লাহ বান্দার গুনাহ সমূহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সকলে বলল - নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন - কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পুরনাঙ্গরুপে ওযু করা, নামাজের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া, এবং এক নামাজের পর আরেক নামজের প্রতীক্ষা করা; আর এ কাজ গুলই হল সীমান্ত প্রহরা। (মুসলিমঃ৪৯৪)

যা খুশি তাই করা?

এখন কেউ বলতে পারে, “বেশ, আমি তাহলে যা খুশি তাই করব, যত খুশি গুনাহ করব তারপর ওযু করে সব ধুয়ে ফেলব।” কিন্তু এরকম মোটেও নয়। আল্লাহর করুণা নিয়ে জাহেলিয়াতের যুগের অবাধ্যদের মত ব্যাঙ্গ তামাশা কোন ক্রমেই করা যাবে না। আল্লাহ বলেনঃ

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“এবং তারা (অবিশ্বাসীরা) শঠতা করল, তাই আল্লাহ ও কৌশল পন্থা গ্রহন করলেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী।” (সূরা আল ইমরানঃ ৫৪)

আল্লাহ তাহলে কি করবেন? তিনি বিদ্রুপের জবাবে ওযুর ফযিলত দিতেই অস্বীকার করতে পারেন।

ওযুর চিহ্ন

আমরা অনেকেই হয়ত আবু হুরায়রা হতে বর্নিত এই হাদিসটি শুনেছি -

‘একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কবরস্থানে গিয়ে বললেনঃ “তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এটা তো ঈমানদারদের কবরস্থান। ইনশাল্লাহ আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমার মনে আমার ভাইদের দেখার আকাঙ্খা জাগে। যদি আমরা তাদেরকে দেখতে পেতাম।” সাহাবাগন বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাবে তিনি বললেনঃ তোমরা হচ্ছ আমার সঙ্গী সাথী। আর যেসব ঈমানদার এখনও (এ দুনিয়াতে) আগমন করেনি তারা হচ্ছে আমার ভাই। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনার উম্মাতের যারা এখনও (দুনিয়াতে) আসেনি, আপনি তাদের কিভাবে চিনতে পারবেন? তিনি বললেনঃ অনেকগুলো কাল ঘোড়ার মধ্যে যদি কারো একটি কপাল চিত্রা ঘোড়া থাকে, তবে কি সে ঐ ঘোড়াটিকে চিনতে পারবেনা? তারা বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তা

অবশ্যই পারবে। তখন তিনি বললেনঃ তারা (আমার উম্মতরা) ওযুর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই হাওযে কাওসারের কিনারে উপস্থিত থাকব।...'(মুসলিমঃ ২/৪৯১)

কাজেই ওযু হল এমন একটি কাজ যার জন্য কিয়ামাতের দিন আমাদের মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে আলাদা করে চিনতে পারবেন। আল্লাহু আকবর।

ওযু মর্যাদা বৃদ্ধি করে

একদিন সকালে মহানবী (সাঃ) ঘুম থেকে উঠলেন, এবং বিলাল (রাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন, "এটা কি রকম যে আমি জান্নাতে তোমার পদধ্বনি শুনতে পেলাম? উত্তরে বিলাল (রাঃ) বলল- হে আল্লাহর রাসুল, আমি এমন কোন গুনাহ করিনি যার জন্য আমি দুই রাকাত করে (তওবা জন্য) নামায পরিনি ; আর যতবার আমার ওযু ভেঙ্গেছে আমি আবার ওযু করে নিয়েছি। তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন- "হ্যাঁ, এটাই ছিল তার কারন।" (ইবনে খুজাইমা)

মিসওয়াক

মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء

"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক না হতো, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময়

মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম" (মুসলিম ২/৪৯৬)

তিনি আরও বলেছেনঃ

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

"মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করায়"(আন নাসাঈ)

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) কত বিচক্ষণ ও যত্নবান ছিলেন দেখুন- তিনি পরিষ্কার ও পবিত্র মুখ নিয়ে তবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেন। তিনি মিসওয়াক করা এতো পছন্দ করতেন যে, যখন তাঁর শেষদিন গুলোতে তিনি অসুস্থ ছিলেন, একদিন আয়েশা (রাঃ) এর ভাই আব্দুর রাহমান (রাঃ) তাঁর ঘরে ঢুকলেন, তাঁর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল। আয়েশা (রাঃ) দেখলেন মুহাম্মাদ (সাঃ) মিসওয়াকটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তার ভাই এর কাছ থেকে সেটি চেয়ে নিলেন এবং চিবিয়ে নরম করে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দিলেন।

আমরা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের মহানবী (সাঃ) এর অনুসরণ করে নিখুঁতভাবে আমাদের ওযু করতে পারি। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১২

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

তাকবীর আল ইহরাম

তাকবীর আল ইহরাম হল নামাজের প্রথম এবং ফরজ একটি কাজ; এটি হল নামাজের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করা।

আল্লাহু আকবার(আল্লাহ্ মহান) ই কেন? কেন *আলহামদুলিল্লাহ*(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বা *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*(আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)নয়? কারণ, আল্লহু আকবর এর অর্থ হল দুনিয়াবি যা কিছুই আছে আল্লাহ তার সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়, মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় আল্লাহু আকবর বলা হয়; আমাদের নামাজে, আজানে, হজ্জে কঙ্কর নিক্ষেপের সময়, ঈদুল আযহায়, ঈদুল ফিতর এ। রমজান সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন -

"...আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে জীবন যাপনের) যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তার জন্য তোমরা তার মহিমা বর্ণনা করতে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা যেন আদায় করতে পার।" (সুরা বাকারাঃ১৮৫)

যখন আমরা নামাযে বলি আল্লাহু আকবর, তখন আমরা আল্লাহর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ শুরু করি। 'আল্লাহু আকবর' অর্থাৎ আল্লাহ মহান - আমাদের কাজের চেয়ে, আমাদের দুশ্চিন্তার চেয়ে, অথবা যে খাবার রান্না করার চিন্তা করছি তার চেয়ে, বা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে যা যা কিছু যত রকমই অন্য চিন্তা ভাবনা আছে তাদের সমস্ত কিছুর চেয়ে আল্লাহ মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই কারনে, নামাজের প্রত্যেকটি ভঙ্গি পরিবর্তনের সময় আমরা বলি আল্লাহু আকবর- যাতে আমাদের মনে যদি নামাজের সময় অন্য চিন্তা ঢুকে পড়ে, এটি মনে করিয়ে দেয় যে এই চিন্তার বিষয়টির চেয়েও আল্লাহ বড়। কেবল মাত্র একটি জায়গায় আল্লাহু আকবর বলা হয়না, সেটি হল রুকু থেকে ওঠার সময়। এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ পরে আলোচনা করা হবে।

হাত ওঠানো

আমরা যখন আল্লাহু আকবার বলি, আমরা হাত উঠাই। মহানবী (সাঃ) তিনভাবে এই কাজটি করতেন বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

১। **আগে** হাত তোলা। প্রথমে হাত উঠানো, হাত নামিয়ে বুকে বাঁধা এবং এরপর আল্লহু আকবার বলা

২। **বলতে বলতে** হাত উঠানো।

৩। **পরে** হাত উঠানো। আল্লাহু আকবার বলা, হাত উঠানো এবং এরপর হাত নামিয়ে বুকে বাঁধা।

এই তিনটি ই হাত তোলার বৈধ উপায়। এবং হাত কোন পর্যন্ত উঠাতে হবে? কান পর্যন্ত ও কাধ বরাবর- দুটিই সঠিক।

দা'ই মিশারি আল খারাজ পরামর্শ দেন এই তিনটি উপায়েই ঘুরিয়ে নামায পড়তে, যাতে আমাদের নামাজের কাজ গুলো অভ্যাসবশত যান্ত্রিক না হয়ে যায়, যাতে আমরা যা করি খেয়াল করে জেনে বুঝে মনোযোগ দিয়ে করতে পারি। এতে আরও একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয় যে আমরা আমাদের নবীর (সাঃ) এর কোন সুন্নাত বাদ দিচ্ছি না। মহানবী (সাঃ) বলেন-

من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا

যে আমার রেখে যাওয়া সুন্নাহর কোন অংশ পুনঃপ্রচলন করবে যা হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে তার অনুসারী সকলের সমান সওয়াব দেওয়া হবে, অথচ কারো অংশ থেকে কম হবে না। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহু আকবার বলতে আসলে কি বোঝায়?

কেউ কেউ আল্লাহু আকবার বলে, এবং মনে মনে এটাই বিশ্বাস করে। আর কেউ কেউ নামায শুরুই করে মিথ্যা দিয়ে। মিথ্যা বলে কারন তারা মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহু আকবার কিন্তু হৃদয় মনে তার দুনিয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা এই উচ্চারণকৃত শব্দটির মর্মার্থ অনুভব করে না।

‘আল্লাহ’ হচ্ছে আমাদের রবের একটি অনন্য নাম, অন্য কাউকে এই নামে ডাকা হয় না, ডাকা যায় না; এবং এর দ্বারা তাকেই বুঝানো হয় যাকে ইবাদত করা হয় ও সিজদা করা হয়। তাঁর অন্যান্য রাজকীয় নাম দিয়ে কখনও কখনও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেমন; সুরা হুদ এ মানুষ হযরত শুহাইব (আঃ) কে বলেছিল -

انَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

নিশ্চয়ই তুমি ধৈর্যশীল (আল হালীম) ও নেককার (আল রাশীদ)। (সুরা হুদঃ ৮৭)

কিন্তু দুটি নাম কখনও মানুষের বেলায় ব্যাবহার করা যায় না, তা হল - ‘আল্লাহ’ ও ‘আর-রাহমান’। এ শুধু মাত্র তাঁর জন্যই।

“আকবার” কথাটি এসেছে তাকবীর থেকে; যার অর্থ মহিমান্বিত করা। আল্লাহ বলেন -

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

তুমি (শুধু) তাঁর ই মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, পরমতম মাহাত্ম্য (সুরা বনি ইস্রাঈলঃ১১১)

আল্লাহর মহত্ত্ব এতই ব্যাপক ও বিশাল যে আমরা পরিপূর্ণ রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পারি না, তবে তাঁর সৃষ্টি সমূহ দেখে কিছুটা মাত্র আন্দাজ করতে পারি। পর্বতমালা, সমুদ্র, গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ এই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি তো কেবল এটাই ঘোষণা করছে- **আল্লাহু আকবার**। তাহলে আমরা কিভাবে না করি?

হ্যাঁ, কিন্তু আমরা হাত উঠাই কেন?

আমরা হাত উঠাই আমাদের দুনিয়াকে পিছনে ফেলে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের জন্য। আপনি যদি কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে দুই হাত তুলে বলেন- আমি সারেন্ডার করলাম। এখানে আমরা নামাজে দাড়িয়ে আত্মসমর্পণ করছি ভালোবাসা, আশা আর ভয় নিয়ে আমাদেরই সৃষ্টিকর্তার সামনে।

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

আমরা যখন নামাজের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলে হাত তুলি, আমাদের গুনাহ গুলি তখন ধীরে ধীরে আমাদের মাথা আর কাঁধে উঠে আসে। মহানবী (সাঃ) বলেন -

إن العبد إذا قام يصلي أُتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه

যখন কোন বান্দা নামাজে দাঁড়ায়, তার সমস্ত গুনাহ তার মাথা এবং কাঁধে রাখা হয়; প্রতিবার যখন সে রুকু অথবা সিজদা করে, সেখান থেকে কিছু গুনাহ ঝরে পড়ে। (বায়হাকি, সহিহ আল জামিই)

আশ্চর্য ! আর কি হয় যখন আমরা নামায আরম্ভ করি? আল্লাহ আমাদের দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরান। নবী করিম (সাঃ) বলেন -

لا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

আল্লাহ তাঁর বান্দার দিকে ততক্ষন তাকিয়ে থাকেন জতক্ষন পর্যন্ত সে নামাজে সালাম না ফেরায় (আবু দাউদ)।

কতকিছু ঘটে যায় যখন তাকবীর দিয়ে আমরা শুধুমাত্র নামাজের প্রথম ধাপ শুরু করি। নির্দিষ্ট এক শয়তান তখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় যার একমাত্র কাজ হল আমাদেরকে নামাজের মধ্যে বিঘ্ন ঘটানো। নামাজে আপনি কথা বলা বন্ধ করে দেন, অকারণে নড়াচড়া বন্ধ করে দেন, এমনকি আপনার দৃষ্টিও এক জায়গায় নিবদ্ধ করে ফেলেন, আশেপাশে বা আকাশের দিকে তাকান না। আপনি তখন এক পবিত্র অবস্থানে থাকেন, আল্লাহর সাথে এক অন্তরঙ্গ আলাপে থাকেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন -

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

পবিত্রতা হল নামাজের চাবি, এর শুরু হয় আল্লাহু আকবার বলে, শেষ হয় আসসালামু আলাইকুম বলে।(আবু দাউদ)

আপনি

আল্লাহু আকবার বলে আরেকটি জিনিস শুরু হয়। সেটি হল নিজেকে নিয়ে ভাবা। ভেবে দেখুন এই মহাবিশ্বে আপনার অবস্থান নিয়ে। ভেবে দেখুন তো এই বিশাল পৃথিবীর তুলনায় সূর্য কত বিশাল। আর এই সূর্যের তুলনায় অন্যান্য নক্ষত্র আরও বিশাল। সেই বিশালতায় আমরা কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। আর এখন বলুন আল্লাহু আকবার...আল্লাহ এই সমস্ত কিছুর চেয়েও বড়, মহান।

এখন থেকে আমরা যখন নামাজে দাঁড়াবো, আমরা যেন এই কথা গুলো লক্ষ্য করি এবং সত্যি সত্যিই তা যেন হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি। আমীন।

চলবে...ইনশাআল্লাহ

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ১৩
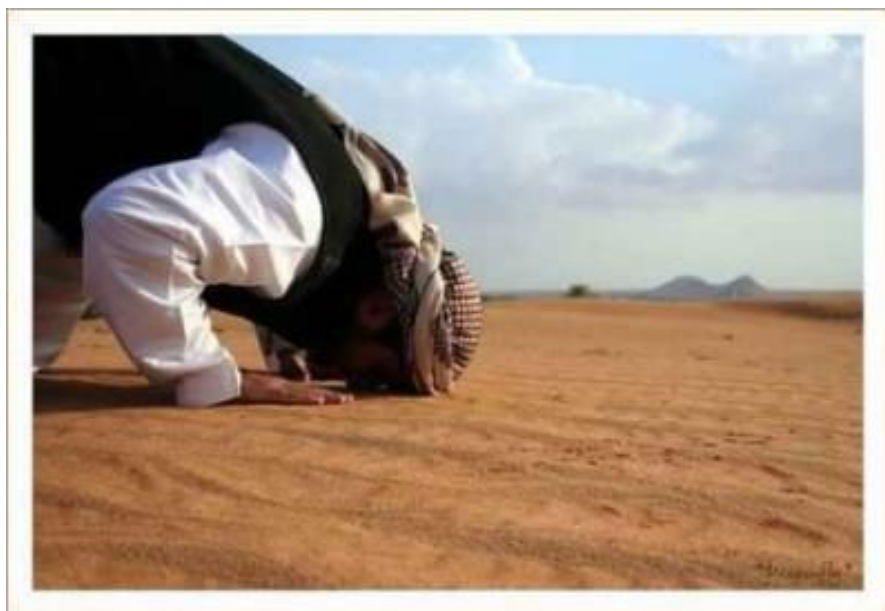
রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

মাথা নিচু করা

যেহেতু আমরা এখন নামায শুরু করেছি, আমরা আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভয়ের সাথে আমাদের মাথা নিচু রাখব। যখন মহানবী (সাঃ) নামাজে দাঁড়াতেন, আল্লাহ্‌র সামনে গভীর বিনয়ে মাথা নিচু রাখতেন আর দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখতেন। ইবনে আল কাইয়িম বলেন- যখন কেউ তার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেখা করে তখন তার ভালোবাসার একটি বহিঃপ্রকাশ হল সে লজ্জা আর শ্রদ্ধায় মাথা নিচু রাখে, এবং আমাদেরও ঠিক এই রকম এ হতে হবে। মহানবী (সাঃ) বলেন-

فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

যখন কেউ নামাজে দাঁড়াবে, সে যেন এদিক সেদিক না তাকায়, কারন আল্লাহ তখন তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাখেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এদিক সেদিক তাকায় (তিরমিযি)।

মহানবী (সাঃ) আরও বলনে-

لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت

বান্দা নামাজের মধ্যে যতক্ষণ এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দৃষ্টি তার দিকে থাকবে (আবু দাউদ ২/৯০৯)।

আমরা অন্যদিকে ঘুরে গেলে কি হয়? নবী (সাঃ) বলেন -

فإذا صرف وجهه صرف عنه

অপরদিকে যখন সে এদিক ওদিক খেয়াল করবে, তখন আল্লাহ ও তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিবেন। (আবু দাউদ ২/৯০৯)

এবং খেয়াল রাখবেন, 'এদিক ওদিক খেয়াল' করার দুটি অর্থ আছে - ১) অন্তরের এদিক সেদিক সরে যাওয়া, অন্যদিকে মনোযোগ চলে যাওয়া এবং অন্যান্য কথা চিন্তা করা, এবং ২) দৃষ্টি সরানো এবং ওপরে, ডানে-বামে তাকানো।

আপনি যদি কোন রাজা বাদশাহর সামনে যান, আপনি এদিক সেদিক ও তাকাবেন না, আবার সরাসরি তার চোখের দিকেও তাকাবেন না। যখন মহানবী (সাঃ)কে মিরাজে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর বিনম্রতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন -

তাঁর কোন দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, এবং তাঁর দৃষ্টি কোন সীমা লঙ্ঘন ও করেনি (সুরা আন-নাজমঃ১৭)।

ইবন আল কাইয়িম বলেন - এটি হল আদব এর একটি উচ্চ পর্যায়। আমর বিন আল আস (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগে মহানবী (সাঃ) কে অত্যন্ত অপছন্দ করতাম। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর তাঁকে দেখে দেখে আমার চোখের সাধ কখন ও মিটত না। কিন্তু যখন তাকে নবীজির বর্ণনা করতে বলা হত তিনি তা করতে পারতেন না, কারন তিনি কখন ও সরাসরি উনার মুখের দিকে তাকাতেন না- এটি ছিল মহানবী (সাঃ) এর সামনে তার আদব।

বিনম্রতা

কখন ও ভাববেন না, আপনি যখন বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ান, নিজেকে ছোট হতে হচ্ছে। মহানবী (সাঃ) বলেন-

من تواضع رفعه الله

আল্লাহ্‌র জন্য যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন (মুসলিম ১৬/১৪১; আদ দারিমী ১/৩৯৬)।

নামাজে চোখ উঠানোকে নবীজি নিষেধ করেছেন। তাই অনেকে প্রশ্ন করে থাকে, তাহলে চোখ কি খোলা রাখতে হবে না বন্ধ করা যাবে? নামাজে চোখ বন্ধ করা নবীর সুন্নায় নেই, কিন্তু ইবনে আল কাইয়িম বলেন, যদি চোখ খোলা রেখে কিছুতেই খুশু না আসে তাহলে মাঝে মাঝে চোখ একটু বন্ধ করা যাবে।

হাতের অবস্থান

নামাজের তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন, আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ে দৃষ্টি অবনত করলেন, এবার বাম হাতের উপর ডান হাত অথবা বাম কব্জির উপর ডান হাত রাখবেন।(বুখারী ২/৭০৪ ইঃফাঃ)

এই ব্যাপারে কিছু রীতিগত মতভেদ আছে। যেমন হানাফি মাজহাবে নাভির নিচে, শাফি ই মাজহাবে নাভির কিছু উপরে। কেউ বুকে হাত বাঁধে, আবার মালিকি মাজহাবে দুই পাশে ঝুলিয়ে রাখে।

বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার কারন কি? ইমাম আহমেদ কেও এক ই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহ্‌র সম্মানে। আপনি যদি কোন প্রাসাদে ঢুকে দেখেন কিছু লোকের মাথা উঁচু এবং হাত কোমরে আর কিছু লোকের মাথা নিচু আর হাত বুকে জড়সড়; আপনি সহজেই বুঝে ফেলবেন কে রাজার লোক আর কে অধীনস্ত।

দুয়া আল ইস্তিফতাহ বা শুরুর দোয়া

আল্লাহকে সম্ভাষণ জানাতে আমরা নামাজের শুরুতে এই দোয়া পড়ি। আপনি যখন কারো সাথে দেখা করেন, বিশেষত এমন কেউ যাকে আপনি গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন, প্রথমেই তাকে আপনি আন্তরিক ভাবে সুন্দর করে সম্ভাষণ জানান। আরবিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষকে সম্ভাষণ জানানোর প্রচলিত রীতি আছে, যেমন; কাউকে শুভ সকাল জানাতে বলা হয় সাবা আল খায়ের অথবা সাবাহ আল ওয়ারদ বা সুবাসিত সকাল। নামাজের শুরুতে এই প্রারম্ভিক দোয়া টি সুন্নাত। যেহেতু আমাদের চেষ্টা নামাজকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুন্দর করে আদায় করা, আমরা এর যতটা সম্ভব সমস্ত দিক আলোচনা করব এবং মহানবী (সাঃ) এর মত নামায পড়ার চেষ্টা করব।

ধরুন আপনার কোন প্রিয়জন আপানকে কোন একটা কাজ করতে অনুরোধ করল এবং আপনি তা করলেন না। তখন সে যদি আপনাকে ডেকে কাজটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আপনি তখন তার অনুরোধ না রাখার কথাটি হয়তো বলতে পারবেন না, বিব্রত বোধ করবেন। আল্লাহ্‌র সামনে আমাদের এই অবস্থা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, কারন ভেবে দেখুন আমরা আল্লাহ্‌র কয়টি আদেশ পালন করেছি? কয়টি নিশেধাজ্ঞা মেনে চলেছি? একারণে আমরা কখনও কখনও নামাজে দাড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করি। একারনেই আমাদের নবী (সাঃ) নামায শুরুর দোয়া হিসাবে আমাদের এই সুন্দর দোয়াটি শিখিয়েছেন -

للهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والب

আল্লাহুম্মা বা-ঈদ বাইনি ওয়া বাইনা খতাইয়াইয়া কামা বা-আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খতাইয়াইয়া কামা ইউনাক্কাসাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস, আল্লাহুম্মা ইগসিলনী মিন খতাইয়াইয়া বিসসালজি ওয়াল মা ই ওয়াল বারাদ

“হে আল্লাহ, আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন দূরত্ব তৈরি করে দিন যেমন দূরত্ব আছে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে, হে আল্লাহ, আমার গুনাহকে আমার থেকে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন শাদা কাপড় থেকে এর ময়লা দূর করা

হয়। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ গুলো ধুয়ে ফেল বরফ দিয়ে, পানি দিয়ে, শিলা দিয়ে” (বুখারি ২/৭০৮ ইঃফাঃ)

দোয়াটির প্রথম অংশে আমরা প্রার্থনা করছি যেন আমাদেরকে ওই পাপ থেকে দূরে রাখা হয় যেগুলো আমরা এখনও করিনি। দ্বিতীয় অংশে আমরা প্রার্থনা করছি যেন যে গুনাহ করে ফেলেছি তা পরিষ্কার করে ফেলা হয়। আর তৃতীয় অংশ আরও উর্দ্ধে, তা হল আমরা আল্লাহ্‌র কছে আমাদের পবিত্র করে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি।

আরেকটি ইস্তিফতাহ্ এর দোয়া নবীজি (সাঃ) করতেন তা হল-

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিক, ওয়াতা বারাক আসমুক, ওয়া তাআ’লা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গইরুকা

‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক’ বলে আমরা ব্যক্ত করি যে আল্লাহ সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে, এবং সমস্ত রকম ত্রুটিমুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য। ‘তাবারাক ইসমুক’ বলতে বোঝায় যখন ই আল্লাহ্‌র নাম কোন কিছুর উপর নেওয়া হয় তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং তাতে বরকত দেওয়া হয়। ‘ওয়া তা’আলা জাদ্দুক’ হল আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উচ্চতম প্রশংসা। আর ‘লা ইলাহা গাইরুখ’

হল এতক্ষণ যা কিছু বলা হল তার স্বাভাবিক পরিনতি যে - তিনি ছাড়া আর কে আছে যে ইবাদতের যোগ্য।

এইসব চমৎকার দোয়া সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন এগুলো হল আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় কথা। কিছু কিছু আলেম বলেন, প্রথম দোয়াটি পড়া হয় ফরজ নামাজে, আর দ্বিতীয় টি পড়া হয় নফল নামাজে।

এই দোয়া গুলো দিয়ে নামায শুরু করে আমরা আমাদের মনকে পরিষ্কার করতে পারি, নিজেদের বিনীত করতে পারি; এভাবে কুরান তিলাওাতের আগে আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে পারব ইনশাল্লাহ।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ১৪

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আপনি কি জানেন, আপনি যখন নামাজে দাঁড়ান, শয়তান তখন প্রচণ্ড রকম হিংসা বোধ করতে থাকে। একারনেই সে নামাজে দাঁড়ানো ব্যক্তির মনকে ভিন্নমুখী করে তাকে নামাজের এই সুউচ্চ সম্মানিত অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলার সমস্ত রকম চেষ্টা চালায়। এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, বেশির ভাগ সময়ই আমরা শয়তানের এই প্ররোচনায় পড়ে যাই। শয়তানের সাদৃশ্য কিছুটা মাছির মত, যতবার দূরে তাড়ান, ঘুরে ফিরে আবার চলে আসে।

শয়তান

নামাজে কুরআন তেলাওাত করার আগে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া শিখেছি। এই শয়তানের প্রভাব বিপুল - আমরা যে জিনিস আগে ভুলেও গিয়েছিলাম নামাজে এসে সেই চিন্তা আমাদের মনে পড়ে যায়, আবার আমরা নানা রকম সমস্যার সমাধানের

ব্যাপারেও চিন্তা করতে থাকি। যখন আমরা সবশেষে সালাম ফিরাই তখন আমাদের আর মনে থাকে না আমরা নামাজে কি কি পড়লাম বা কত রাকাত পড়লাম। আপনার অবস্থাও যদি এরকমই হয়, তাহলে ইবনে আল কাইয়িম এর মতে এই ব্যক্তির নামাজের শেষেও সেই অবস্থা থেকে যায় যেমনটি নামায শুরুর সময় ছিল; তার গুনাহের বোঝা যেমনটি ছিল তেমনই থেকে যায়। এই জীবনে যদি এমন অবস্থা চলতে থাকে, আমাদের পরকালে তাহলে কেমন অবস্থা হবে? কুরআন এ আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন -

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান জাহান্নামীদের বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিল) সত্য ওয়াদা, আমিও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতঃপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া

দিয়েছ, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা (কোন রকম) দোষারোপ করোনা, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের ওপরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনরকম) সাহায্য করতে পারব না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোন সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে (আগে) আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়েছ, আমি তাও আজ অস্বীকার করছি (এমন সময় আল্লাহ্‌র ঘোষণা আসবে); অবশ্যই জালিমদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (সুরা ইব্রাহীমঃ২২)

ভেবে দেখুন, কিয়ামতের দিন নিজের এরকম প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার পর বিবেক যন্ত্রণায় বিদ্ধ অবস্থা। মহানবী (সাঃ) বলেছেন -

إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها

خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها

‘এমন অনেক লোক আছে যারা নামাজ পড়ে কিন্তু তাদের নামাজ পুরপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হয় না।বরং তাদের কেউ এক দশমাংশ, বা এক নবমাংশ, বা এক অষ্টাংশ, বা এক সপ্তাংশ, বা এক ষষ্ঠাংশ, বা এক পঞ্চমাংশ, বা এক চতুর্থাংশ, বা এক তৃতীয়াংশ, বা অর্ধেক সওয়াব পায়।’ (আবু দাউদ ১/৭৯০, ইঃফাঃ)

কাজেই শয়তান যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে আমাদের নামায থেকে চুরি করে সওয়াবের পরিমান কমিয়ে দিতে। আমাদের ভাবতে হবে যেন আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের পুরষ্কার পেয়ে গেছি কিন্তু আমাদের তা পাহাড়া দিতে হবে- কারন আমারা যখনই অমনোযোগী হই শয়তান আমাদের সওয়াবের কিছু অংশ চুরি করে নিয়ে যায়। এবং আমাদের কারো কারো ক্ষেত্রে শয়তান চুরি করতেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা খালি হয়ে যাই।

সমাধান

শেইখ আল-শিনকিতি বলেছেন, আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আমরা নিজেদেরকে মানুষ শয়তান এবং জীন শয়তান থেকে রক্ষা করব। আল্লাহ বলেন -

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [৪১:৩৩

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [٤١:٣٤]

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদেরই একজন।(হে নবী), ভাল আর মন্দ কখনই সমান হতে পারে না; তুমি ভাল (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (সুরা হা-মীম-আস সাজদাঃ ৩৩, ৩৪)

এভাবে আমরা মানুষ শয়তান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি, আমাদের খারাপ কে ভাল দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। এটা আমাদের শুধু রক্ষাই না বরং হয়তো আমাদের শত্রুকে মিত্রতে পরিনত করতে পারে। কিন্তু এই কাজটিও সহজ নয়, আল্লাহ পরবর্তী আয়াতেই বলেছেন-

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

আর এ (বিষয়টি) শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে যারা ধৈর্য ধারন করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী (সুরা হা-মীম-আস সাজদাঃ৩৫)

কিন্তু জীন শয়তানের বেলায় কি করব? উপরের পদ্ধতিটি আমরা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবনা। তাহলে কি করব? আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে, কারন আল্লাহ্ উপরল্লখিত আয়াতের পরপরই বলেছেন -

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর যদি কখনও শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (সুরা হা-মীম-আস সাজদাঃ৩৬)

এটা একটা গল্পে সুন্দর করে বোঝান হয়েছে- এক বৃদ্ধ লোক এক যুবককে প্রশ্ন করল তুমি শয়তান কে দেখলে কি করবে? যুবকটি উত্তর দিল - মারব। বৃদ্ধের প্রশ্ন - আবার আসলে? আবার মারব। আবার একই প্রশ্নে যুবকটি একই উত্তর দিল। তখন বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলল- রাস্তায় তোমার সামনে

যদি একটি হিংস্র কুকুর আসে তুমি কতবার ওকে মেরে তাড়াবে? তারচেয়ে এটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ না যে তুমি এর মালিককে ডেকে কুকুরটাকে পথ থেকে সরাতে বল।

একারনেই আমরা নামাজের শুরুতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। ইবনে আল কাইয়িম বলেছেন- আমরা যখন নামায পড়ি আল্লাহ্‌ তাঁর আর আমাদের মাঝের পর্দা উঠিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন, আর আমরা সরাসরি আল্লাহ্‌র মুখমুখি হয়ে যাই, আবার যখন অন্যদিকে মন ঘুরিয়ে নেই, তখন আবার পর্দা নেমে আসে। শয়তান তখনই আমাদের মনে একটার পর একটা চিন্তা দিয়ে ব্যস্ত করে ফেলে, কিন্তু যখন পর্দা সরানো থাকে তখন সে এ কাজ করার সাহস পায় না।

কাজেই, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় চাইব, অর্থ বুঝে নামায পড়ব এবং নিজেদেরকে নামাজের মাধ্যমে শয়তানের কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১৫

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আল্লাহ্র নামে

আমরা এখন নামাজে একটি সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছেছি, আমরা সবচেয়ে সুন্দর নামটি উচ্চারণ করি - বিসমিল্লাহ। এই রাজসিক নামের উচ্চারণ আমাদের অন্তরে শান্তি আনে, সমস্ত জায়গা ও সব সময় নিরাপত্তার অনুভূতি দেয় - এই নামের স্মরণ ছাড়া আত্মা কি শান্তি পায়? কোন মুসলিমের অন্তরে অবস্থিত তাঁর এই নামটিই সবচেয়ে অসাধারণ বিস্ময়কর ব্যাপার, কারন এমন কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস নেই যা এই নামের বরকতে বৃদ্ধি না পায়, আবার এমন কোন বড় জিনিষ নেই যা এই নামের বরকতে অনুগ্রহ না পায়। এই নামটি এতই চমকপ্রদ, এটি যেকোনো জায়গার, যে কোন সময়ের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা দেয়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন-

কেউ যখন কোন স্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে সে যেন বলে, আউযু বিকালিমা তিল্লা হিততা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট হতে), কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার তার বাহনে আরোহণ করে।(মুয়াত্তা ৫৪/১৩৩৪)

এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ালা আপনাকে হেফাজত করবেন, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ইনশাল্লাহ। আর সকল সময়ের নিরাপত্তার জন্য মহানবী (সাঃ) বলেছেন-

"بِسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّماءِ وَهوَ السّميعُ العَليم
من قالها ثلاثاً إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء

'বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়া দুররু মা'আসমিহি শাইআন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামা-ই ওয়াহুয়াস সামিউল আলীম' (আমি সেই

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা)যে এই দোয়া সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিন বার বলবে, কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (আবু দাউদ ৪১/৫০৬৯)

ইবনে আল কাইয়িম বলেন, শুধুমাত্র নামের মহত্ত্বই যদি এমন হয়, তবে সেই নামধারীর মহত্ত্ব কেমন হওয়ার কথা! আপনি যখন কাউকে ভালবাসেন, তখন আপনি তার নামও বার বার নিতে ভালবাসেন। কায়েস আর লায়লার বিখ্যাত কাহিনী লায়লা মজনুর কাহিনী নামে আমরা সবাই জানি। কায়েসের বাবা তাকে হজ্জ এ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে তার ছেলের এই 'ভালবাসার রোগ' সেরে যায়। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে করতে কায়েসের অবস্থার উন্নতি হয়ে আসছিল। কিন্তু শেষদিকের এক দিনে তারা যখন মিনায় ছিল, এক লোক তার এক মহিলা সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলার পর জোরে জোরে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলো - লায়লা! লায়লা! যতবার সেই লোক নামটি ধরে ডাকতে লাগলো, সেই নামটি শুনেই কায়েসের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো, তার 'ভালবাসার রোগ' আরও তীব্র হয়ে ফিরে এলো। আমাদের সবারই যদি এমন ভালবাসা আমাদের সৃষ্টিকর্তার জন্য থাকতো!

কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তখন দৃঢ় ও স্থির থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরন করবে, আশা করা যায় তোমরাই সাফল্য লাভ করবে। (সুরা আনফালঃ৪৫)

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই প্রসঙ্গে বলেন, মুমিন বান্দারা এমন যুদ্ধরত অবস্থাতেও আল্লাহর নাম নিতে, তাঁকে স্মরন করতে ভালবাসে। আনতারা নামক একজন ইসলাম পূর্বের যোদ্ধা ও কবি তার এক কবিতায় বর্ণনা করেছিল কিভাবে সে তীরবিদ্ধ হয়েও তার প্রেমিকা আবলা কে মনে করছিল। যুদ্ধের ময়দানেও যেমন করে এরা তাদের ভালবাসার জনকে স্মরন করে, আল্লাহও আমাদেরকে সংগ্রামের সময় বেশি করে তাঁকে স্মরন করতে বলেছেন।

ইবনে আল কাইয়্যিম ভালবাসার জনকে নিয়ে নির্জনতার আনন্দের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ইবনে তায়মিয়া তার শহর ছেড়ে মরুভূমিতে চলে যেতেন যাতে তিনি আল্লাহর সাথে নির্জনতা উপভোগ করতে পারেন। আগের সেই কবিরা যেমন তাদের ভালবাসার মানুষের স্মরনে শান্তি পেত, আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ালার স্মরনে তার চেয়েও অনেক বেশি প্রশান্তি অনুভব করা। আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কি কেউ আছে? তিনি ছাড়া আর কে আছে যে আমাদের প্রার্থনার জবাব দেন? তাঁর চেয়ে বেশি কে আর আছে আমাদের প্রতি এত দয়ালু?

কাজেই, যখন নামাজে আমরা বলি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম", এটি আল্লাহর সাথে আমাদের কথোপকথনের শুরু হওয়া নির্দেশ করে। আপনি যখন কুরআনের প্রথম সুরা 'সুরা ফাতিহা' তেলাওয়াত করা শুরু করেন, আল্লাহ তায়ালা তখন আপনার তেলাওাতের সাথে সাথে জবাব দেন। ইবনে জারীর বলেন, তিনি এটা ভেবে আশ্চর্য হন যারা কোন কিছু না বুঝেই কুরআন পড়ে যায় তারা কি করে এর মাধুর্য আস্বাদন করবে? আমাদের জানা মতে সুরা ফাতিহাই হচ্ছে একমাত্র সুরা যার তেলাওয়াতের সাথে সাথে আল্লাহ জবাব দেন। এর আর কি কি রহস্য আছে?

আল ফাতিহা

বিসমিল্লাহ বলার পর প্রথমেই আমরা যে আয়াত পড়ি তা হলঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতসমূহের রব। (সুরা ফাতিহাঃ১)

আল-হামদ হল একই সাথে আল্লাহর প্রশংসা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। আর **হামদ** হল ভালবাসা আর সম্মান এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি অনেক গভীর একটি শব্দ, যার আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগামী পর্বগুলোতে করব ইনশাআল্লাহ। এর গুরুত্ব বোঝাতে রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

الحمدلله تملأ الميزان

'আলহামদুলিল্লাহ' ওজন দণ্ডের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দেবে (সহিহ মুসলিম ২য় খণ্ড, হাদিস ৪৪১)

আমরা যা কিছু অনুগ্রহ আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলব; এটাও মনে রাখব যে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারাটাও আল্লাহ্‌রই আরেক অনুগ্রহ, কারণ এমন বহু মানুষ আছে যারা আল্লাহর এত অনুগ্রহ অনুধাবনও করতে না পেরে তা অস্বীকার করে।

رَبِّ الْعَالَمِينَ

এই কথাটি দ্বারা বোঝায় - 'সৃষ্টি জগতসমূহের রব'। রব তিনিই যার সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব আছে, যিনি সমস্ত কিছুর পালনকর্তা, সমস্ত মানুষের এবং সমস্ত জিনিসের মালিক। "জগতসমূহ" বলতে বোঝায় সমস্ত সৃষ্টিকুল যার মধ্যে রয়েছে মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, পশুপাখি ও আন্যান্য সবকিছু; যার প্রতিটিকে একেকটি জগত বলা যেতে পারে, যেমন 'ফেরেশতাদের জগত', 'পশুজগত', 'মানব জগত'

বা ‘জ্বিন জগত’। এটা ছোট বড় সব ধরনের সৃষ্টির ব্যাপারেই বলা যায়; যেমন ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ও নিজস্ব জগত আছে। বেশির ভাগ সময়ই আমরা আল্লাহর সৃষ্টির এই বিশালতা ও ব্যপকতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই, এবং আল্লাহর সৃষ্টির উপর তাঁর ক্ষমতার ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যাই।

যে কোন একটি জগতের জটিলতা কিছুটা আন্দাজ করার জন্য আমরা শ্বেতকনিকার উদাহরন নিতে পারি। মাত্র একফোঁটা রক্তের মধ্যে প্রায় সাত হাজার থেকে পঁচিশ হাজার শ্বেতকনিকা থাকতে পারে।

এখন একটি কথাই বলার থাকে -

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতসমূহের রব।

ইনশাল্লাহ, পরবর্তী পর্বে আমরা সুরা ফাতিহার অর্থ আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করব।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১৬

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবা

সুরা ফাতিহা হল সেই সুরা যা আমরা প্রতি ওয়াক্তের প্রতি রাক'আতে পড়ি- দিনে কমপক্ষে ১৭ বার। কাজেই এই সুরার প্রতিটি আয়াতের বিস্তারিত অর্থ আমাদের জন্য জানা একান্ত প্রয়োজন যাতে আমরা যা পড়ি তার সাথে নিজের অন্তরকে যুক্ত করতে পারি।

আজ আমরা অংশ নেব এক অনন্য সাধারণ যাত্রায় যা আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা গেঁথে দিতে সাহায্য করবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ বলেন-

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে।......(সুরা ইউনুসঃ ১০১)

আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন তাঁর সৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আর এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য। নিচের ভিডিওটি আমাদের এক শ্বাসরুদ্ধকর ভ্রমণে নিয়ে যাবে।

এই অতল বিশাল সৃষ্টির সামনে আমরা কত নগণ্য। আমরা কখনও ভেবে দেখেছি আমাদের আর বেহেশতসমূহের মধ্যে দূরত্ব কতখানি? আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্টিত হয়েছেন।...(সুরা আল 'আরাফঃ ৫৪)

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাওয়াতা'আলার কিভাবে আরশে সমাসীন হন তা আক্ষরিক অর্থে আমরা বুঝতে পারব না। কারণ আল্লাহ আরও বলেন -

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অর্থাৎ 'কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়' (সুরা আশশুরাঃ১১)

যাহোক, এটি আমাদের আজকের আলোচনার প্রসঙ্গও না। আমরা ভিডিওটিতে যা দেখলাম তা যদি মাত্র প্রথম আসমান হয়, তাহলে কল্পনা করে দেখুন এরকম সাতটি আসমান রয়েছে; আবার এই সাত আসমানের উপরে রয়েছে আল্লাহর কুরসী এবং তাঁর আরশ।

আমরা কি সেই কুরসী কল্পনা করতে পারি? মহানবী(সাঃ) বলেছেন -

ما السماوات السبع في الكرسي ، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة

*কুরসীর মধ্যে সাত আসমান ধু ধু প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত আংটির চেয়ে বেশি কিছু না। (ইবনে হাযার)**

কুরসী যদি এমন হয়, আরশ তাহলে কেমন? তখন নবীজি (সাঃ) বলেছেনঃ

فضل العرش على الكرسي ، كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة

*আরশের তুলনায় কুরসী প্রান্তরের তুলনায় কড়ার মত।**

আমরা কি এই বিশালত্ব কল্পনা করতে পারি? তাহলে আমরা কিভাবে অহংকার করতে পারি? আমরা কিভাবে আল্লাহর সামনে দাড়াতে পারি এবং তাঁর বিশালতা ও মহানুভবতা অনুভব না করে পারি? আমরা মাঝে মাঝে মানুষের নানান সাফল্য ও কীর্তি যেমন উচ্চতম বিল্ডিং নির্মাণ, উড়োজাহাজের ওড়া, ক্লোনিং দেখে অবাক হই। কিন্তু আমরা যখন আল্লাহর প্রাকৃতিক সৃষ্টিসমূহ একে একে আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ করি তখন আমরা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের এক অনুভুতি নিয়ে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে যাই। এই কথা গুলো মাথায় রেখে আমরা নবীজি (সাঃ) এর এই হাদিসটি পড়ি-

فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

যখন কেউ নামাজে দাঁড়াবে, সে যেন এদিক সেদিক না তাকায়, কারন আল্লাহ তখন তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাখেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এদিক সেদিক তাকায় (তিরমিযি)।

আমরা তাহলে কি করে আমাদের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে পারি? ভেবে দেখুন আল্লাহর বিশালতম সৃষ্টি থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি সমূহের কথা। এ সমস্ত কিছুই কত চমৎকারভাবে চলছে, আমাদের কোন রকম সাহায্য বা অংশগ্রহন ছাড়াই। আমরা শুধুই বলতে পারিঃ 'আলহামদুলিল্ললাহি রাব্বিল 'আলামীন' -সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টি জগত সমূহের রব।

নামাজঃ একটি কথোপকথন

সুরা ফাতিহা সম্পর্কে আল্লাহ হাদিসে কুদসি তে বলেছেন-

আমি সালাত (সুরা ফাতিহা) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি, আর, আমার বান্দা যা চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে।

বান্দা যখন বলেঃ *আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন* বা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য, আল্লাহ তখন বলেনঃ **আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল**।

যখন বান্দা বলেঃ *আর রহমানির রহীম*বা পরম করুনাময় অতি দয়ালু, তখন আল্লাহ বলেনঃ **আমার বান্দা আমার গুণগান করল**।

যখন বান্দা বলেঃ *মালিকি ইয়াওমিদ্দীন*বা প্রতিফল দিবসের মালিক, তখন আল্লাহ বলেনঃ **বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল**।

যখন বান্দা বলেঃ *ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্ তা'ঈন*বা আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ **এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চাইবে**।

অতঃপর যখন বান্দা বলেঃ *ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম; সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম গইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দল্লীন* বা আমাদের সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের তুমি নিয়ামত দিয়েছ, তাদের পথ নয় যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ **এ সব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে**। (সহীহ মুসলিম ২য়ঃ৭৭৪)

আমাদের রবের সাথে কি চমৎকার কথোপকথনই না হয় আমাদের! ইবন আল কায়্যিম বলেন, সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হল আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ যখন নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)কে ইসরা এবং মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-

যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।(সুরা আল ইসরাঃ১)

মানুষের দাসত্ব অপমানজনক; কিন্তু আল্লাহর দাসত্ব, যার সাথে থাকে ভালবাসা, তা হল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের বিষয়।

আমরা যেন সবাই আল্লাহর প্রতি গভীর সম্ভ্রম আর ভালবাসার অনুভুতি নিয়ে নামাজে দাড়াতে পারি। আমীন।

**ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়া আন নিহায়া ১ম খণ্ড থেকে*

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়? পর্ব ১৭
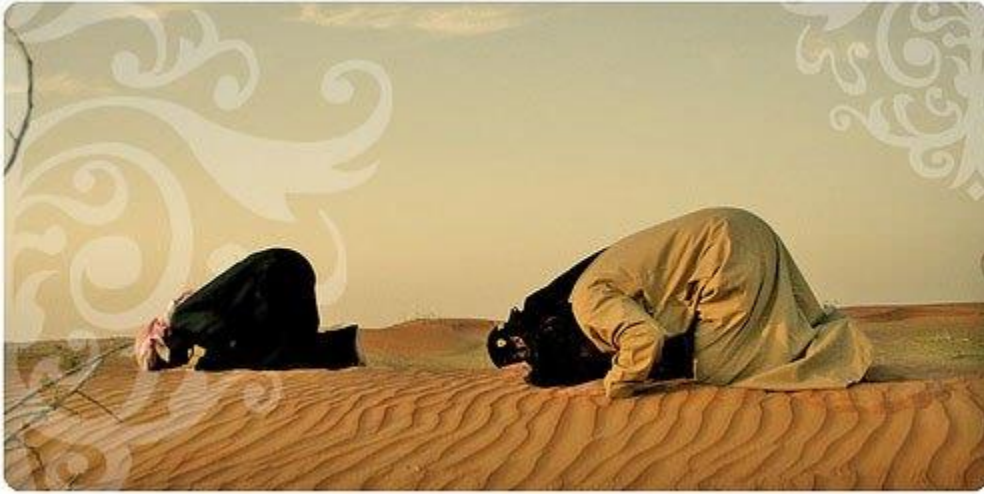
রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

আল ফাতিহার মাধুর্য

আমরা ১৫তম পর্বে আলোচনা করেছি "আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন" বলতে কি বুঝি। গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সুরা ফাতিহা হল আমাদের আর আল্লাহ সুবহানা ওয়ালাতা'য়ালার সাথে কথোপকথন। সম্ভবত নামাজে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াতের সময়টিই সেই সময় যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি খুশুর প্রয়োজন, কারণ এ সময় আল্লাহ আমাদের জবাব দেন। কিন্তু সাধারণত সুরা

ফাতিহা তেলাওয়াতের সময়ই আমাদের খুশু সবচেয়ে কম থাকে, কারণ এই সুরা আমরা বারংবার পড়তে পড়তে অভ্যাসে পরিনত করে ফেলেছি; এই অবস্থাটি পরিবর্তন করতে হবে।

আমরা যদি এই সুরার আয়াতের ক্রমের দিকে লক্ষ্য করি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারেঃ আল্লাহ কেন প্রথম আয়াত 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব' এর পরপরই 'আর রহমানির রহীম' বা পরম করুনাময়, পরম দয়ালু এই আয়াতটি বললেন? ইবনে উথাইমীন বলেন - কারণ আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ভিত্তি হল মুলত করুনা বা দয়াময়তা। আমরা যখন পড়ি 'আল্লাহ সকল সৃষ্টি জগতসমূহের রব' তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তিনি কেমন রব? আল্লাহ এই আয়াতে তারই উত্তর দিয়েছেনঃ

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

যিনি পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু (সুরা ফাতিহাঃ ২)

পরম করুনাময়, পরম দয়ালু

সুরা ফাতিহা পড়েছেন এমন অনেকেই 'আর রহমান' ও 'আর রহীম' এর মধ্যে পার্থক্য জানেন না। এটা অনুবাদ করা হয় 'পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু'। মিশরের একজন বিখ্যাত ইসলামিক আলোচক আমর খালেদ এই পার্থক্যটাকে এভাবে ব্যখ্যা করেছেনঃ

আল্লাহ যখন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর এই দুনিয়াতে দয়া বর্ষণ করেন তখন তিনি 'আর রহমান'। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ

বলুনঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাত্রে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।(সুরা আম্বিয়াঃ ৪২)

অপরদিকে 'আর রহীম' বলা হয় যখন আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত বিশ্বাসীদের উপর বর্ষণ করেন। যেমনঃ খাদ্য, পানি ইত্যাদি রহমতসমূহ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকেই করুনাময় আল্লাহ দিয়ে যাচ্ছেন; আবার রমজান মাসে বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ আতিশয় দয়ালু আল্লাহ শুধু বিশ্বাসীদেরই দিয়েছেন।

'আর রাহমানির রাহীম' এর পরপরই **'প্রতিফল দিবসের মালিক'** কেন? যদি উল্টোটা হত তাহলে আমাদের অন্তর ভীতিতে ভরে যেত। প্রথমে আমরা পড়ি আল্লাহই আমাদের রব, তারপরে তিনিই প্রতিফল দিবসে আমাদের বিচার করবেন। আমরা নিজ নিজ আমলের ব্যপারে ওয়াকিবহাল। কাজেই আমরা যদি বিচার দিবসের ভয়াবহতার আগে আমাদের রবের করুনার কথা জানতে পারি তবে ভয়ের মাঝেও আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহই প্রতিফল দিবসের মালিক।

করুনা

আমাদের উপর আল্লাহর করুনা আমরা সবসময় উপলব্ধি করতে সক্ষম হই না। চলুন নিচের ভিডিওটি দেখিঃ

দেখুন কিভাবে চিতাবাঘটি বেবুনের বাচ্চাটিকে পরম মমতায় আগলে রেখেছে- সুবহানাল্লাহ! এই শিকারী জন্তুটি যদি এমন একটি প্রানীর উপর করুনা আর মমতায়

আচ্ছন্ন হতে পারে যেটি তার শিকার হতে পারত, তাহলে আমরা কি করে আল্লাহর নিজের 'সৃষ্টির' উপর তাঁর করুনার ব্যপারে সংশয় রাখতে পারি? আল্লাহর করুনা প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) কি বলেছেন দেখুন-

“ইবনে আবু মারিয়াম (র)...উমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী(সাঃ) এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী আসে। বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল (তার শিশু সন্তান হারিয়ে গিয়েছিল যদিও পরে তাকে খুঁজে পেয়েছিল)। সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কলে নিত এবং নিজের দুধ পান করাত। নবী (সাঃ) আমাদের বল্লেনঃ তোমরা কি মনে কর এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললামঃ না ফেলার ক্ষমতা রাখলে সে কখনও ফেলবে না। তারপর তিনি বল্লেনঃ এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।” (সহীহ বুখারি ৯ম খণ্ডঃ ৫৫৭৩)

কাজেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর ক্ষমা, ধৈর্য ও করুনার জন্য আমরা গভীরভাবে আশা রাখব। তারপরও আমাদের এর জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ বলেছেন-

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (সুরা ত্বা-হাঃ৮২)

আমরা কি আল্লাহর সেই বান্দাদের মধ্যে একজন হব না যা্দের উপর আল্লাহ্ তাঁর পরম করুনা বর্ষণ করবেন? আমরা তা ই আশা করি, ইনশাআল্লাহ। আর আমরা আসলেই যে তা চাই তার প্রমাণস্বরূপ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা ও আমল করব।

সেই গোপন চাবিকাঠিটি মনে আছে তো? আল্লাহর সাথ। কথা বলুন। যখনই বলবেন **আর রহমানির রহীম**, মনে রাখবেন আল্লাহ্ জবাব দিচ্ছেন - '**আমার বান্দা আমার গুনগান করল**'। এটা মনে রেখে আপনার অন্তরকে নরম করুন যে আপনি তাঁর সাথে কথা বলছেন যিনি আপানারই উপর পরম করুনাময়।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ১৮

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

অসীম ক্ষমতাধর

আজ আমরা সেই সুরা ফাতিহা যা আমরা প্রতিদিন পড়ি তার অর্থ আরও একটু গভীরে আলোচনা করব। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, আমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের নামাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে আরও বেশি করে নিবেদিত করা আর আমাদের অন্তরকে আল্লাহর কালাম দিয়ে জীবিত করা। এটা শুধু আমরা যা পড়ি তার সারমর্ম শিখেই করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সেই অর্থ গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা করা।

আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি কিভাবে আল্লাহ 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বা 'প্রতিফল দিবসের মালিক' বলার ঠিক আগেই 'পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু' বা 'আর রহমানির রহীম' আয়াতটি বলেছেন; যাতে আমরা জানতে পারি যে- যিনি প্রতিফল দিবসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি হলেন পরম করুনাময়।

আরবী ভাষায় 'মালিক' শব্দটির উচ্চারণের কারনে এর অর্থে সামান্য ভিন্নতা আছে। বহুল ব্যবহৃত উচ্চারণ হল - 'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন' অর্থাৎ মীম এর উপর লম্বা টান বিশিষ্ট খাড়া যবর এর উচ্চারণ। আরেকটি উচ্চারণ হল- مَالِكِ يَوْمِ الدِّين বা 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'। এই দুটি উচ্চারণই সঠিক। তবে 'মা-লিক' এবং 'মালিক' এর অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম তফাত রয়েছে। 'মা-লিক' বলতে বোঝায় কোন কিছুর অধিকারী হওয়া বা যার দখলে কোন কিছু আছে এমন। 'মালিক' হল কোন কিছুর উপর এমন আধিপত্য থাকা যে সেটির উপর যেমন খুশি তেমন কর্তৃত্ব করা যায়। কোন ব্যক্তি হয়তো কোনকিছুর শুধু 'মা-লিক' হতে পারে, 'মালিক' নয়; অথবা উল্টোটাও হতে পারে। যেমন, একজন প্রেসিডেন্টের একটি দেশের উপর কর্তৃত্ব বা আধিপত্য থাকে, সে দেশের সম্পদ যেমন খুশি তেমনভাবে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু ৫ বা ১০ বছর পর তার সেই পদ থাকে না। এক্ষেত্রে সে *মালিক* ছিল, কিন্তু *মা-লিক*নয়। কারণ যার উপর তার ক্ষমতা ছিল, সেই দেশের পদের সে চিরস্থায়ী অধিকারী নয়। আবার, এমনও আছে যে, কোন রাজা বা রানী বংশ পরম্পরায় কোন দেশের রাজত্বের চিরস্থায়ী অধিকারী হয়ে থাকে, যেমনটি আছে যুক্তরাজ্যের বেলায়। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই যা আছে সেই দেশের প্রধান মন্ত্রীর। এক্ষেত্রে সেই রাজা বা রানীকে সেই দেশের *মা-লিক*বলা যায়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে *মালিক*নয়।

আল্লাহ সুবহানা ওয়াতা'য়ালা *মা-লিক*এবং *মালিক*দুটোই। তিনি কিয়ামত দিবসের এবং সেদিন যা ঘটবে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

প্রতিফল দিবস

যখন আমরা যখন বলিঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين বা 'প্রতিফল দিবসের মালিক', আমরা এই শব্দগুলোর ক্ষমতা, ব্যপকতা ও গুরুত্ব খুব কম ই অনুধাবন করতে পারি। প্রতিফল দিবস হল চূড়ান্ত হিশাব-নিকাশের দিন, যেদিন আমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো, আমাদের জীবদ্দশায় যা কিছু করেছি তার বিচার হওয়ার জন্য। আল্লাহ কেন তাঁর এই দিনের আধিপত্যের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে উল্লেখ করছেন, যখন তিনি একবার বলেই দিয়েছেন যে তিনিই সমস্ত জগত সমূহের রব, যাতে বিচার দিবসও অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শেষ পরিণতি স্মরন করিয়ে দেওয়ার জন্য, যে আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবো আমাদের আমলনামা নিয়ে, এবং এটা দেখানোর জন্য যে এই দুনিয়াতে মানুষের যত প্রভাব,

প্রতিপত্তি, আধিপত্য ও ক্ষমতা আছে তা সব বিলীন হয়ে যাবে; রয়ে যাবে শুধুই তাঁর সর্বময় অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। সেই দিন আমাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করার শক্তি থাকবে না যদি না মহান আল্লাহ আমাদেরকে অনুমতি দেন, যেমন আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। [সুরা নাবাঃ ৩৮]

তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও জন্য সুপারিশও করতে পারবে না।

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? [সুরা বাকারাঃ২৫৫]

আমাদের সবসময় এটা মনে রাখা দরকার যে, আমরা যতটা ভাবি, বিচার দিবস আসলে তার চেয়ে অনেক নিকটবর্তী। আল কুরতুবি বলেছেন - প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার নিজস্ব 'বিচার দিবস' শুরু হয়ে যায়। কেউ এটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। কেউ যদি একে পাশ কাটিয়ে যেতে পারত তবে নিশ্চয়ই মহানবী (সাঃ) এর জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হতেন, কারণ তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। কিন্তু যখন রাসুল (সাঃ) এর মৃত্যুক্ষণ এসে পড়েছিল, তিনি তাঁর সামনে রাখা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন আর বলতেন -

لا اله الا الله ان للموت سكرات

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে।’ [সহীহ বুখারি ১০/৬০৬৬ ইঃফাঃ]

সেই দিবসের দৃশ্যাবলী

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা সবাই শুনেছি। আল্লাহ বলেন-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

সূর্যকে যখন দীপ্তিহীন করা হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, পর্বত সমূহকে যখন চলমান করা হবে, যখন পূর্ণগর্ভা উটনী উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে, এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে; *[সুরা তাকভীরঃ১-৬]*

আরও ভালভাবে বুঝার জন্য আমরা ঝড়, ভুমিকম্প বা পর্বতের অগ্নুৎপাতের ধ্বংসলীলার অসংখ্য ভিডিও দেখতে পারি। কেয়ামত দিবসের তুলনায় এই সব ধ্বংসলীলা কিছুই না।

আমরা সবাই আমাদের কবর থেকে বের হয়ে আশব, আর যারা যারা অবিশ্বাসী তারা বলবে-

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। [সুরা ইয়াসীনঃ৫২]

সেইদিন সূর্যকে আমাদের নিকটবর্তী করা হবে, আর সবাই এমনভাবে ঘামতে থাকব যে কারও কারও ঘাম তাদের চিবুক পর্যন্ত উঁচু হবে। শুধুমাত্র সাত শ্রেণীর মানুষ ছায়ার নিচে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর বাদ বাকি সবাই ভয়াবহ আতঙ্কে থাকবে, তখন হঠাৎ-

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন, আর ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে থাকবে।[সুরা ফাজরঃ৮৯]

এবং আল্লাহর নূর আসমান সমূহকে ঢেকে ফেলবে,

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এই ব্যপারে এদিক-অদিক করতে পারবে না; দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।[সুরা ত্বা-হাঃ১০৮]

কে থাকবে সেদিন নিরাপদে?

এর জবাব পাওয়া যাবে সুরা ফাতিহার এই আয়াতে-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু তোমার ই এবাদত করি এবং শুধু তোমার ই সাহায্য প্রার্থনা করি

এর প্রমান কি? আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

আমি নূহ (আঃ)কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম, সুতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক মহা দিবসের শাস্তি আশঙ্কা করছি।[সুরা 'আরাফঃ৫৯]

কাজেই, সেই প্রতিফল দিবসের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর ইবাদত ই আমাদের সেই মহাদিবসের শাস্তি থেকে বাঁচাবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা যখন এই আয়াত গুলি তেলাওয়াত করব, তখন আমরা মনে রাখব যে আল্লাহই আমাদের 'মা-লিক' এবং 'মালিক', এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো আর সেইদিন তিনি ছাড়া কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে খুশুর সাথে নামাজ আদায় করার তৌফিক দিন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ১৯
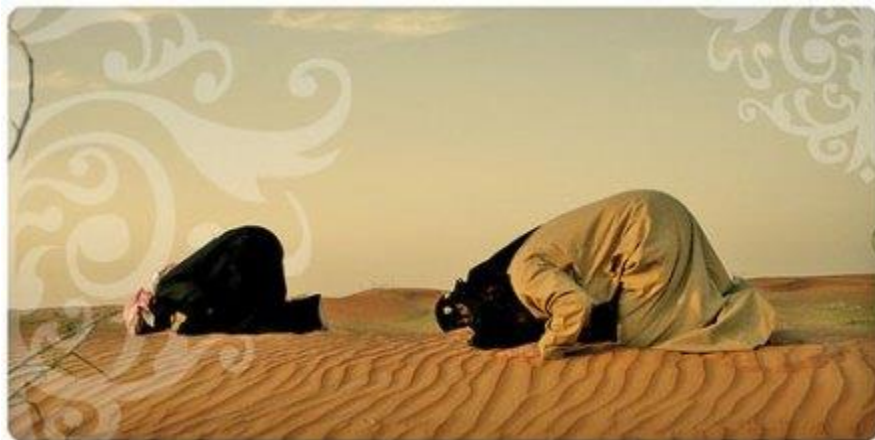
রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

শুধু তোমারই ইবাদত করি

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা’আলা ১০৪ টি আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। সেই সবগুলো কিতাবের সারাংশ হল কুরআন, আর সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় সুরা ফাতিহায়। আর সম্পূর্ণ সুরা ফাতিহার সারাংশ হল এই আয়াতঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (সুরা ফাতিহাঃ৪)

আল্লাহর রহমত ও সর্বময় পরম ক্ষমতার বিষয়ে জানার পর, এবং তারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেকথা উপলব্ধি করার পর, এই আয়াত টি আমাদের জানিয়ে দেয় আমাদের এই পৃথিবীতে কি করণীও, আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি- শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা আর এই কাজেও তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা।

ইবাদতের আন্তরিকতা ও সততা

অন্তরের ইবাদতের একটা অংশ হল **শুধুমাত্র** আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। মহানবী (সাঃ) বলেন,

قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শিরক)থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারী

(শিরক) সহ বর্জন করি'(অর্থাৎ তার আমল্ল নষ্ট করে দেই) [বুখারী ২৯৮৫]

আমরা যখন বলি **'ইয়্যাকা না'বুদু'** বা আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, তখন আমরা আমাদের 'ইখলাস' বা ইবাদতের সততা ও আন্তরিকতার ঘোষণা দেই, এবং নিজেদেরও সেকথা স্মরণ করাই। কাজেই আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিৎ- আমরা যখন কোন ভাল কাজ করি, আমরা কি অন্যদের কাছ থেকে কোন রকম প্রশংসা বা বাহবা আশা করি? আমরা যদি তা না পাই, তাহলে কি মনে মনে কষ্ট পাই বা হতাশ হই? যদি হই তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের সেই 'ভাল কাজটি' শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছিল না, পাশাপাশি অন্যের জন্যও ছিল। ইবনে কাইয়্যিম বলেছিলেন, এর প্রতিকার হল, এটা বোঝা ও আত্মস্থ করা যে- কারও প্রশংসা আমাদের কোনরকম উপকার করতে পারবে না, কারও নিন্দাও আমাদের কোনরকম ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন, যদি সবাই **ভাবে** যে আমরা সত্যবাদী, কিন্তু আল্লাহর কাছে আমরা আসলে তার উল্টোটা, সেই 'সবাই' কি আমাদের কোন উপকারে আসবে? অথবা কোন ধনী লোকের ব্যপারে যদি সবাই বলে বেড়ায় যে 'সে ঋণগ্রস্ত, সে আসলে ধনী নয়', তাহলে কি এতে ঐ ধনী ব্যক্তির সম্পদের কোন ঘাটতি হয়ে যাবে?

উপরন্তু, আমাদের এটা মনে রাখা উচিৎ যে, অন্যরা যদি এটা বুঝতে পারে যে আমরা অন্যের প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোন নেক কাজ করছি, তাহলে তারাও আমাদের ব্যপারে মন্দ ধারনাই পোষণ করবে। তাহলে আমরা কিভাবে আমাদের মনের এই অবস্থা গোপন করব, যখন আমরা অন্যেরা কি ভাববে এটা নিয়েই বেশী চিন্তিত থাকি; অথচ যিনি আমাদের অন্তরের সব খবর জানেন তার ব্যপারেই আমরা গাফেল থাকি? এই লোক দেখানো আমলই হল 'রিয়া'।

সবচেয়ে জঘন্য রিয়া হল সেটা যেটাতে মিথ্যাও মিশ্রিত থাকে, যেমন এমন কোন লোক যে এমন আমলের জন্য মানুষের কাছে প্রশংসিত হতে চায় যা সে আসলে করেইনি। আল্লাহ বলেনঃ

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা স্বীয় কৃতকর্মে কর্মে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তজ্জন্যে প্রশংসা প্রার্থী, এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারনা করোনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”(সুরা আল ইমরানঃ১৮৮)

রিয়ার প্রতিকার কি? সবসময়, বারবার নিজেদের নিয়তের ব্যপারে নিজেকে প্রশ্ন করা এবং নিজেকে সংশোধনের সঙ্কল্প করা। আমরা যদি অনেক আমল জনসম্মুখে করি, তাহলে তার সমান অথবা তার চেয়ে বেশী আমল গোপনে কাউকে না বলে করার চেষ্টা করতে হবে। এটা হল এই আয়াতের সারাংশ, এবং এইজন্য আমরা প্রতিদিন এটা পড়িঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা’ঈন - আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

গোপন রিয়া

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শৈশব থেকেই আমাদের ভেতর রিয়ার বীজ বপন করা হয়ে থাকে। কিভাবে? আমাদের বলা হয়, ‘এমন করো না, লোকে কি বলবে?’ অথবা বলা হয়, ‘অমন করো না, তুমি কি চাও লোকে তোমাকে বলুক তুমি আদব কায়দা জান না?’। অথচ বলা উচিৎ ছিল- এটা বা ওটা করোনা কারণ আল্লাহ দেখছেন। কাজেই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা বেড়ে উঠেছি রিয়ার মধ্য দিয়েই। লোকজনের অনুপস্থিতিতে আমরা অনেক কিছুই করে ফেলতে পারি, কারণ কেউ

তো দেখছে না! এভাবে আমরা আল্লাহর সামনে লজ্জা বোধ করার চেয়ে মানুষের সামনে বেশী লজ্জা বোধ করি।

এই গোপন রিয়া আমাদের অন্তরের গভীরে এত দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে যে, যখন আমরা নির্জনে ইবাদত করি বা নির্জনে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি, তখনও অজান্তেই রিয়া করে ফেলি। কিভাবে? পরবর্তীতে নিজের এমন কাজের জন্য নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে বা এমন আশা করে করে যে - কেউ যদি দেখত তাহলে আমাদের কেমন ভাবত! অথবা, আমরা যখন নিজেদের মহান মৃত্যুর কথা কল্পনা করি যেমন, সেজদারত অবস্থায় মৃত্যু, তখন আরও যদি ভাবি এমন ভাবে মৃত্যু হলে লোকে কি কি ভাল কথা বলাবলি করবে, এমনটি না ভেবে যে আল্লাহর সাথে এমন ভাবে সাক্ষাত হলে কেমন হবে।

আমাদের অন্তরের এমন অবস্থায় আমাদের উচিৎ এই আয়াতটি বেশী বেশী পড়ে অন্তরকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা, আমাদের নিয়তের ব্যপারে সজাগ থাকা, এবং ইবাদতের সততার গুরুত্ব অনুধাবন করা।

নরম অন্তরের মানুষেরা

যারা সত্যিকার অর্থে এই সুরা ও এই আয়াতের মর্ম বুঝেছেন তাদের উপর এটি সুগভীর প্রভাব ফেলে। মুযাহিম বিন জাফর এর সূত্রে, সুফিয়ান আস-সাওরি নামক একজন মহান তাবি'ই (মহানবী (সাঃ) এর পরের প্রজন্মের মানুষ) একদিন মাগরিব নামজের ইমামতি করছিলেন। তিনি যখন সুরা ফাতিহার এই আয়াতে এসে পৌঁছলেন, তিনি এমন ভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন যে তিনি আর পরবর্তী আয়াত তেলাওয়াত করতে পারছিলেন না। তারপর তিনি আবার প্রথম থেকে এই সুরা পড়া শুরু করলেন।

মোহাম্মদ আল হিমসি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি আল হাওয়ার নামক আরেকজন সালাফ (সঠিক পথের অনুসারী প্রথম দিকের সত্যনিষ্ঠ মুসলিম) এর কথা, যিনি কাবা শরীফে ঈশার নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে আসলেন "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন" তিনি এর পরে আর পড়তে পারছিলেন না, তিনি ভীষণ কাঁদতে লাগলেন। এটা দেখে আল হিমসি তার কাবা ঘর তাওয়াফ করা চালিয়ে গেলেন, এবং যখন তিনি আবার ঘুরতে ঘুরতে আল হাওয়ারির কাছে আসলেন, দেখলেন তিনি তখনও ঐ আয়াতটিই তেলাওয়াত করছেন।

আপনার কি ধারণা তারা অতীতের লোক ছিলেন বলেই এমন করে অনুভব করতে পারতেন? তাহলে এই ভিডিওটি দেখুন।

এটা ছিল শায়খ সউদ আল-সুরাইমের প্রথম বছর যে বছর তিনি পুরো রমজান মাসে তারাবী নামাজের তেলাওয়াত করেন। সাধারণত সেখানে সবচেয়ে বেশী ভিড় থাকে ২৭ রমজানে (লায়লাতুল কদরের আশায়) এবং ২৯ রমজানে কারণ সেদিন কুরআন তেয়ালাওাত খতম দেওয়া হয়। যাই হোক, বিশেষ করে সেই বছর ২৭ রমজানে কুরআন তেলাওয়াত খতম করা হয়েছিল- একারনে মানুষের উপস্থিতি সেদিন এত বেশী হয়েছিল যে তা বিচার দিবসের কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্ভবত এ কারনেই শায়খ এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যখন তিনি তেলাওয়াত করছিলেন - 'মালিকি ইয়াও মিদ্দীন' (প্রতিফল দিবসের মালিক)।

শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি - বিনম্রতা

আন্তরিকতা ও সততা হল সেই উপকরণ যার কারনে আমরা নামাজ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে পারি; আর আমরা সত্যিকার অর্থে আন্তরিকও হতে পারব না যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য না চাই। একারনে আল্লাহ আমাদেরকে 'শুধু তোমারই ইবাদত করি' বলার পরপরই শিখিয়েছেন 'শুধুমাত্র তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি'। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন-

كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم

"তোমাদের সকলের জন্য রয়েছে ধ্বংস তাদের ছাড়া যাদের আমি সাহায্য করি, অতএব আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং আমিই তোমাদের সাহায্য করব"।

একারনে পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

আমাদের সরলতম পথ দেখাও(সুরা ফাতিহাঃ৫)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কেমন নিখুঁত ভাবে তার কালাম গুলো সাজিয়েছেন!

ইবনে আল কাইয়্যিম বলেছেন তিনি ইবনে তাইয়মিয়্যাকে বলতে শুনেছেন, ‘ইয়্যাকা না’বুদু’ এবং ‘ইয়্যাকা নাসতা’ঈন’ বা ‘শুধুমাত্র তোমারই বন্দেগী করি’ ও ‘শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি’ কথা দুটি মানুষের অহংকার ও দম্ভকে দূর করে দেয়। আমরা যখন বলি ‘আমরা তোমারই সাহায্য চাই’ তখন আমরা স্বীকার করে নেই যে আমাদের সেই ক্ষমতাটি নেই যে আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারব এবং আমাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। আমরা প্রায়ই এমন কথা শুনি বা বলি যে ‘কেউ এত অহঙ্কারী যে কারও কাছে হাত পাতে না’, এমন লোক নিজেকে অন্যদের চেয়ে উঁচু মনে করে বা নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করে। অপরদিকে এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা স্বীকার করছি যে আমরা অক্ষম, তাই সেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ যেন আমাদের সততা, আন্তরিকতা ও বিনম্রতার সাথে তাঁরই ইবাদত করতে সাহায্য করেন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২০
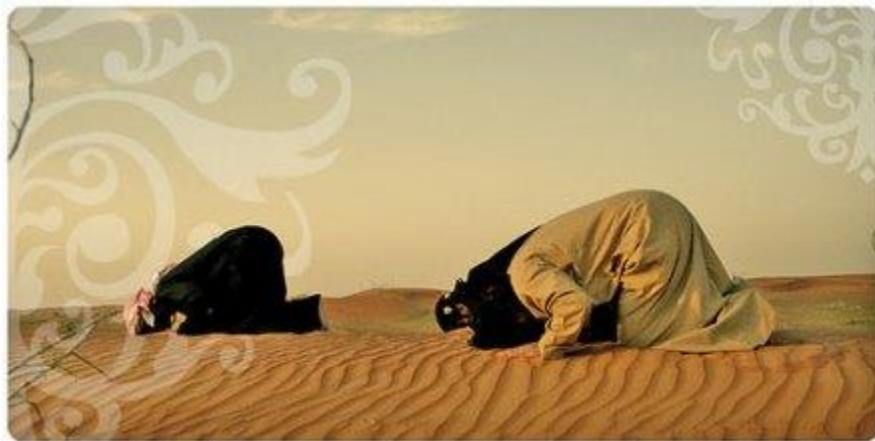
রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

আগের পর্বগুলোতে সুরা ফাতিহার আলোচনায় জেনেছি, কিভাবে বিশেষতঃ এই সুরাটির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতে পারি, এবং আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের সাথে সাথে কিভাবে জবাব দেন। এই সুরা আল্লাহর রুবুবিয়াতের (আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি জগতসমূহের রব) ঘোষণা দেয়, সাথে সাথে এটাও বর্ণনা করে যে আল্লাহর রুবুবিয়াতে রয়েছে তাঁর রহমত ও করুনার প্রাধান্য, যে কারনে সৃষ্টি জগতসমূহের রবের প্রশংসার পর পরই আমরা বলি -'আর রহমানির রহীম'। কিয়ামত দিবসের মালিকত্বের বর্ণনার আগেই আমরা জানতে পারি যে তাঁর করুনা তাঁর ক্রোধের চেয়ে বেশী। অতঃপর আমরা জানতে পারি কেন আমাদেরকে এই করুনা করা হয় - যাতে আমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। এবং তাঁর ইবাদত করতেও আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। একারনে আমরা বলি -

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

"শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি"

কাজেই আমরা যদি সাহায্য পেতে চাই, আমাদেরকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

পথপ্রদর্শন

এখন আমরা প্রকৃতপক্ষে দোয়া শুরু করছি।

اهدِنَا الصِّرٰطَ المُستَقيمَ ﴿٦﴾ صِرٰطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَلَا الضّالّينَ ﴿٧﴾

"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের নয় যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট।" (সুরা ফাতিহাঃ৬-৭)

ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, সুরা ফাতিহার এই দোয়াটিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞতম, এবং সবচেয়ে উপকারী দোয়া। আল্লাহ যদি আমাদের সরলতম পথ প্রদর্শন করেন, তিনি আমাদের তাঁর ইবাদত করতেও সাহায্য করেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, 'আমি যদি সঠিক পথেই থাকি তবে আবার কেন পথপ্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করব? আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, কুরআন তেলাওয়াত করি- আল্লাহ তো নিশ্চয়ই আমাকে হেদায়াত করেছেনই।' প্রথমত, হেদায়াতের সর্বোচ্চ পর্যায় হল মহানবী (সাঃ) এর সমান পর্যায়ে পৌছতে পারা, অথচ আমরা কেউই এমনকি সাহাবীদের পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছি বলেও দাবী করতে পারি না। একারনেই আমরা প্রার্থনা করি যাতে আল্লাহ আমাদের আরও বেশী করে হেদায়াত দান করেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও তাঁর সামনে আমাদের বিনয়াবনত অবস্থার উপর হেদায়াত প্রাপ্তি নির্ভর করে, এবং আল্লাহর কাছে আরও হেয়াদায়াতের জন্য প্রার্থনাও সেটাই সাক্ষী দেয়। আমরা যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনাই না করি, তবে আমরা কি করে দাবী করতে পারি যে আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছি? মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

من لم يسأل الله يغضب عليه

'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন' (সুনান ইবনে মাজাহঃ৩৮২৭ ইঃফাঃ)

ইবনে কাইয়্যিম বলেছেন, আমরা আল্লাহর কাছে যে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করি তাতে দুইটি বিষয় রয়েছে, ইলম এবং আমল, আবার এই দুটোই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ। কোন বান্দার সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকতে পারে, যেমন কি করা উচিত, কোনটা পরিত্যাগ করা উচিত, কিসে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, কিসে অসন্তুষ্ট হবেন। বান্দার অজ্ঞতার পরিমান তার জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে। কাজেই, আমরা আল্লাহর কাছে যখন পথ প্রদর্শনের বা হেদায়াতের প্রার্থনা করছি, তখন আল্লাহর কাছে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্যও প্রার্থনা করছি। আবার অনেক সময়, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছু আমল করতে পারি আবার অনেক কিছুই করতে পারি না। যেমন আমরা জানি, আমাদের হজ্জ করতে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের অনেকেরই সাধ্য থাকে না। আবার, অনেক সময় আমাদের জ্ঞান আর সাধ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের নফসের বা প্রবৃত্তির কারনে অনেক আমল আমরা করতে পারি না। যেমন আমরা কিয়াম-উল-লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজের অপরিসীম ফজীলতের কথা জানি, কিন্তু আলস্যের কারনে অনেকেই এই নামাজ পড়ার উদ্যোগ নিতে বা ঘুম থেকে উঠতে পারি না। আমরা যখন আল্লাহর কাছে হেদায়াত চাই, তখন এই প্রার্থনাও করি যেন আল্লাহ আমাদের অন্তর বা নফসকেও সংশোধন করে দেন।

আবার, এমনও হতে পারে যে আমাদের জ্ঞান, সাধ্য, সৎ আমল করার সদিচ্ছা সবই আছে, কিন্তু তারপরও হয়তো আমরা সত্যিকার ভাবে আন্তরিক হতে পারছি না। হয়তো আমাদের নিয়ত পুরপুরি খাঁটি নয়। আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করার অর্থ এটাও প্রার্থনা করা যেন তিনি আমাদের আন্তরিক হওয়ার তৌফিক দেন। কারণ আমলে অন্তর উপস্থিত থাকা আমাদের সঠিক পথে অটল থাকতে সাহায্য করে। আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করার অর্থ এটাও প্রার্থনা করা যেন আমরা মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাহ পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারি, এবং এতে দৃঢ় ও অটল থাকতে পারি।

সীরাতুল মুসতাকিমঃ সরলতম পথ

“আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন যে রাসুল (সাঃ) কি কিয়ামত দিবসে উনার হয়ে সুপারিশ করবেন কিনা। উত্তরে নবীজী (সাঃ) বললেন, ‘করব’। তখন আনাস (রাঃ) আবার প্রশ্ন করলেন, আমি আপনাকে ঐ দিন কোথায় খুঁজে পাব? উত্তরে রাসুল (সাঃ) বললেন, ‘আমাকে যখন তোমার প্রয়োজন হবে, আমাকে পুলসীরাতের কাছে খুঁজবে’। আনাস (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, আর যদি সেখানে খুঁজে না পাই? মহানবী (সাঃ) বললেন- ‘তখন আমাকে মীযানের (দাঁড়িপাল্লার)

কাছে খুঁজবে’। আনাস (রাঃ) আবার প্রশ্ন করলেন, মীযানের কাছেও যদি না পাই তবে আপনাকে কোথায় খুঁজে পাব? মহানবী (সাঃ) জবাবে বললেন, ‘তখন আমাকে হাউয এর কাছে খুঁজবে। আমি তখন এই তিনটি জায়গা ছাড়া কোথাও যাবো না।” (তিরমিযীঃ ২৪৪২; আহমাদঃ ১২৮২৫)

কাজেই, রাসুল (সাঃ) এর কাছে সুপারিশ চাওয়ার প্রথম জায়গা হবে পুলসীরাত। পুলসীরাত হল জাহান্নামের উপর দিয়ে সেতু যার অপর প্রান্তে রয়েছে জান্নাত। এটি চুলের মত সরু এবং পিচ্ছিল একটি সেতু। আমরা কিভাবে এই সরু ও পিচ্ছিল পুলসীরাত পার হব? মানুষ তার আমল অনুযায়ী এই সেতু পার হবে।

রাসুল (সাঃ) বলেন, পুলসীরাত হল মারাত্মক পিচ্ছিল জায়গা, যার উপর লহার আংটা এবং বড় ও বাঁকা ফাটা থাকবে, যা দেখতে নাজদ এলাকার সা’দান গাছের কাঁটার মত। মুমিনগণ এ পুলসীরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে,

কেউ উড়ন্ত পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহিহ সালামতে পার হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ ক্ষতবিক্ষত দেহে পার হবে। আবার কোন হতভাগ্য আগুনে পতিত হবে। শেষ নাগাত মু'মিনরা দোযখ থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। (মুসলিমঃ ৪৬২)

ইবনে আল কাইয়্যিম বলেন- আল্লাহ এই দুনিয়াতে সরল পথ অবলম্বন করতে বলেছেন। যে এই দুনিয়াতে সরল পথে চলার জন্য হেদায়াত প্রাপ্ত হবে, পরবর্তী জীবনে সেই পুলসীরাত ও তার জন্য সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা এই জীবনে সরল পথের উপর কতটুকু দৃঢ় থাকব তার উপর আমাদের আখেরাতের জীবনে সেই সীরাতে আমাদের অবস্থা নির্ভর করবে।

আমরা কি তাহলে এখন বুঝতে পারছি, যে দোয়াটি আমরা প্রতিদিন করছি তার গুরুত্ব কতখানি?

আমীন

যখন আমরা সুরা ফাতিহার শেষে "আমীন" (হে আল্লাহ, কবুল কর) বলি, তখন তা আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ থেকে বলা উচিত। কারণ, এই সুরার সমস্ত অর্থ অনুধাবন করার পর, আমাদের অন্তরে গভীর অনুরক্তি ও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত যেন আল্লাহ আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করে নেন। আবার, আমাদের মন যদি আমাদের প্রার্থনার মধ্যে না থাকে, তাহলে সে দোয়ার জবাব আল্লাহ দিবেন না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه

“আল্লাহর কাছে এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করবে যে আল্লাহ জবাব দিবেন, জেনে রেখ অবহেলার আর অমনোযোগী হৃদয়ের প্রার্থনার জবাব আল্লাহ দেন না।” (তিরমিযী)

ইবন আল কাইয়্যিম বলেছেন, যখন কেউ সুরা ফাতিহা পড়ে, সে যেন প্রতিটা আয়াত থেমে থেমে পড়ে, কারণ আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের জবাব দিচ্ছেন। উম্মে সালামা (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসুল (সাঃ) এমন করে থেমে থেমে পড়তেন।

আল্লাহ যেন আমাদের সরলতম পথে হেদায়াত দান করেন এবং আমাদের নামাজে আমাদের অন্তরকে সামিল রাখার তৌফিক দেন। আমীন

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়? পর্ব ২১
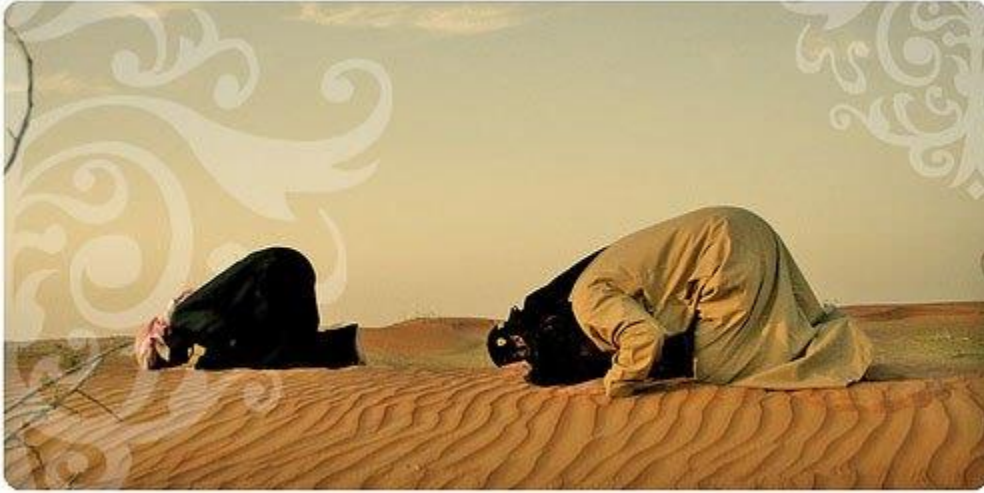
রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

গত পর্বে আমরা সরল পথের কথা বলেছিলাম যেটি আমাদের এই জীবনে অনুসরণ করতে হবে যাতে আমরা পরকালে সহজে পুলসীরাত পার হতে পারি। আমরা তখন সূরা ফাতিহায় আরও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করি আমরা কোন সরল পথের সন্ধান চাই। আমরা বলিঃ

صراط الذين أنعمت عليهم

“তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন”

আমরা যখন এই আয়াতটি পড়ব, আমাদের অন্তরকে নরম করব, কারণ আমরা সেই নবী (আঃ) গণ, রাসুল (সাঃ), সাহাবাগণ (রাঃ), সত্যের পথ অনুসরণকারীগণের কথা স্মরণ করছি যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ রহমত নাযিল করেছেন। এই আয়াতটি পড়ে আমরা স্বস্তি পাই কারণ আমরা জানতে পারি, যারা এই সরল পথ অবলম্বন করে চলেন আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন; কাজেই যখন অন্যেরা আপনাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, আপনার আকীদার ব্যপারে লজ্জিত হবেন না। অথবা আপনার মদ্যপান না করা, দাড়ি-টুপি পড়া বা হিজাব পড়া নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, কুঁকড়ে যাবেন না। কুরআনের অনেক সূরাতে আমরা নবীগনের এমন কাহিনী পাই, যা আমাদের রাসুল (সাঃ) কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয় যখন তিনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন। এই আয়াতটিও আমাদের জন্য ঠিক তেমনই হওয়া উচিত- আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা যতক্ষণ সরল পথ অনুসরণ করব, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই আয়াতের বাকী অংশে আমরা পড়িঃ

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

“তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট।”

তারা কারা যাদের উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হয়েছে? ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন এরা তারা যারা সব কিছু জেনেও তা অনুসরণ করে না। আর পথভ্রষ্ট তারা যারা জ্ঞান রাখে না। আমাদের এই দুই পথ সম্পর্কেই সাবধান থাকতে হবে যাতে আমরা এর কোন একটিও অনুসরন না করি। কাজেই সরল পথে থাকতে হলে আমাদের জ্ঞান এবং আমল দুটোরই সমন্বয় করতে হবে।

সূরা ফাতিহা আমাদের সঠিকভাবে দোয়া করার পদ্ধতিও শিখিয়ে দেয়- যে আমরা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে দোয়া শুরু করব, তারপর আমাদের প্রয়োজনের কথা বলব।

আমীন

আমরা গত পর্বে 'আমীন' বলা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে জেনেছি, যে আমরা কিভাবে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে আকাঙ্খা করব যেন তিনি আমাদের সূরা ফাতিহায় যা চাওয়া হয়েছে তা দেন। আবার আমরা যখন আমীন বলি তখন অন্য ব্যপারও ঘটে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

"যখন ইমাম বলবে 'গাইরিল মাগদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন' তখন তোমরা বলবে 'আ-মীন'- অর্থ আল্লাহ আপনি কবুল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারীঃ ৪১২৩ ইফা)

আমরা যখন আমীন বলি যার অর্থ 'হে আল্লাহ কবুল করুন', ফেরেশতারাও বেহেস্তে আমীন বলে, আর তা যদি আমাদের বলার সাথে মিলে যায় তাহলে আল্লাহ আমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেবেন। একারনেও আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে এটা বলা উচিত- যাতে আল্লাহ আমাদের আন্তরিক দোয়া কবুল করেন এবং আমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন।

কুরআন

আমরা সূরা ফাতিহা পড়ার পর ছোট কোন সূরা তেলাওয়াত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মাঝে মাঝে আমরা নামাজে অতিঅভ্যস্ততার কারণে মনেও করতে পারি না কোন সূরা পড়ে ফেলেছি। আমাদের যাদের এই সমস্যা আছে, তাদের আল্লাহর এই কথা গুলো স্মরণ করা উচিত যে, আল্লাহ বলেছেন -

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদঃ ২৪)

মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল ক্কারযী বলেন- রাত থেকে ভোর পর্যন্ত সূরা যালযালা থেকে সূরা ক্কারিয়াহ পড়া এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার কাছে চিন্তাবিহীন সমগ্র কুরআন পড়ার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর একজন প্রতিবেশী বর্ণনা করেন যে, যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন তখন তিনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করে থামতেন। আবার কিছুক্ষন পর আরেকটি আয়াত তেলাওয়াত করে থামতেন। প্রতিবেশীটি তাকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি এরূপ করতেন যাতে আয়াতের কথাগুলোর প্রতি তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন। আমরা প্রায়ই গুনগত মানের চেয়ে পরিমানের দিকে বেশী প্রাধান্য দেই। আমরা কেউ কেউ পুরো এক পারা কুরআন তেলাওয়াত করে ফেলি, অথচ এর পর যদি কেউ প্রশ্ন করে এই পারা পড়ে কি কি শিখলাম, হয়তো কিছুই বলতে পারি না। ইবনে কাইয়্যিম বলেন কেউ যদি কুরআন পড়ে লাভবান হতে চায়, সে যেন নিশ্চিত করে যে তার অন্তরও তারা সাথে উপস্থিত আছে; সে যেন আল্লাহর কথাগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তেলাওয়াত করে বা শ্রবণ করে, এটা যেন ভাবে যে আল্লহ তাকেই উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছেন।

আল্লাহর এই সব কালাম এতই শক্তিশালী যে আল্লাহ বলেন-

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله

“যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড়

বিনীত হয়ে আল্লাহ তা’আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।” (সূরা আল হাশরঃ ২১)

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য কেমন রূপক উপস্থাপন করেছেন। কেমন করে কুরআনের ওজন বুঝিয়েছেন; যা আমরা প্রতিদিন তেলাওয়াত করে যাই কিন্তু মোটেও অনুধাবন করি না যে কথাগুলো আমাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে এবং আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য বলা হয়েছে। আমরা অনেকেই বলি যে আমরা তো আরবী ভাষা বুঝি না, অথচ আমাদের নামাজে পড়ার জন্য কিছু সূরা বা কিছু আয়াত অন্ততঃ মুখস্থ করা আছে। আমাদের সেই সব সুরা বা আয়াতের তাফসীর পড়তে হবে যাতে আমরা তার অর্থগুলো বুঝতে পারি এবং তা তেলাওয়াত করার সময় আমাদের অন্তর তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ কয়েক পৃষ্ঠা করে যে সূরা গুলো জানি তার তাফসীর পড়ব তাহলে বেশী সময়ও লাগবে না। আমরা কয়েকজন একত্র হয়েও এই কাজ করতে পারি এবং জামা’আতে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য তাতে বরকতও লাভ করতে পারি।

ইবনে কাইয়্যিম বলেন, আমাদের মধ্যে ভালবাসা, ভয় এবং আশা এই তিন অনুভূতি থাকতে হবে। আমরা যখন আল্লাহর রহমত বিষয়ক আয়াত পড়ব তখন আমাদের জীবনে আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করে অন্তরে ভালবাসা অনুভব করতে হবে। যখন আমাদের পূর্ববর্তীদের কথা পড়ব ও তাদের উপর আসা শাস্তির কথা পড়ব, তখন আমাদের অন্তরে এই ভেবে ভয় অনুভব করতে হবে যে আমরাও তাদের অনুরূপ শাস্তি পেতে পারি। যখন আমরা এমন আয়াত পড়ব যেখানে আল্লাহর ক্ষমার কথা বলা হয়েছে, তখন আমরা আশান্বিত হব আল্লাহর দয়ার কথা ভেবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নামাজ কোন একতরফা কথামালা নয়, নামাজ হল আল্লাহর সাথে একান্তে কথোপকথন। আর কুরআন হল আমাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বানী।

আল্লাহ যেন আমাদের কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে ও তা থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করেন এবং নামাজে আমাদের অন্তর কে সামিল করার তৌফিক দেন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ২২

রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

রুকুঃ বাহ্যিক আমল

নিজেদেরকে নামাজের জন্য প্রস্তুত করার মানে হল এটা উপলব্ধি করা যে আমরা কার সামনে দাড়াতে যাচ্ছি- আল্লাহ সুবহানা ওয়াতা'আলার সামনে, আমাদের রবের সামনে, সমস্ত দয়ালুর চেয়েও মহান সেই দয়ালু ও পরম করুনাময়ের সামনে। আমরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন করি কারণ আমরা পবিত্রতম সত্তা আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছি; আর আমাদের অন্তরকে বিনীত করি কারণ আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াচ্ছি যিনি সর্বোচ্চ মহান। আমাদের মন ভয় আর আশার মাঝে অবস্থান করে, কিন্তু পুরো মন জুড়ে থাকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা। যখন আমরা সূরা ফাতিহা পড়ি, আমরা প্রতিটি আয়াত একটু থেমে থেমে পড়ি কারণ আল্লাহ স্বয়ং আয়াতগুলোর জবাব দিচ্ছেন এবং আমরাও যেন সেই আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে পারি। আর যখন এরপর অন্য একটি ছোট সূরা পড়ি, আমরা বুঝতে পারি এই কালামগুলো আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন।

যখন আমরা সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পাঠ করে শেষ করব; তারপর আমাদের দুইহাত উঠিয়ে বলব "আল্লাহু আকবর"।

'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।' (সহীহ বুখারীঃ ৭০০ ইফা)

মনে রাখবেন, নামাজের মধ্যে প্রায় প্রতিটি ভঙ্গি পরিবর্তনের সময় আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলি (রুকু থেকে উঠার সময় ছাড়া)। এতে আমরা নিজেদেরকে সজাগ করি এবং এটা স্মরণ করাই যে আমাদের মনের ভেতরের দুনিয়াবি সমস্ত কিছুর চেয়ে আল্লাহ মহান। তারপর রুকুতে আমরা আমাদের মাথা ঝুকাই। আর যখন আমরা মাথা নোয়াবো, তখন তা আমরা আমাদের নবী (সাঃ) অনুকরণে করব। রুকুর সময় হাত দুটিকে হাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখব এবং আঙ্গুলগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখব (সুনানে আবু দাউদঃ ৮৬৮ ইফা)।

আমরা অনেকেই রুকু এবং সিজদায় যেয়ে তাড়াহুড়া করি, অথচ এই রোকনগুলোতে যথাযথ সময় পর্যন্ত আমাদের অবস্থান করা খুবই জরুরী।

'বারা'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ছাড়া নবী (সাঃ) এর রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমান ছিল।' (সহীহ বুখারী ৭৫৬ ইফা)

'হাফস ইবনে উমর (রাঃ)... যায়িদ ইবনে ওয়াহব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইফা (রাঃ) এক ব্যাক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকু ও সিজদা ঠিকমতো আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি

তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।' (সহীহ বুখারীঃ ৭৫৫ ইফা)

রুকুর দোয়া

আমরা আগের পর্বগুলোতে উল্লেখ করেছিলাম যে নামাজের শুরুতে বিভিন্ন দোয়া বা সানা আছে (পর্ব ১৩)। ঠিক তেমনি রুকুরও বিভিন্ন দোয়া আছে। আমরা চেষ্টা করব সেই দোয়া গুলো মুখস্থ করে নিতে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেক সময় একেক দোয়া পড়তে; যাতে দোয়া গুলো আমাদের সচেতন প্রার্থনা হয়, শুধুমাত্র মুখস্থ বুলি না হয়।

১। আমরা তিনবার বলবঃ

سبحان ربي العظيم

সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম

"আমার মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি" [সহীহ আত-তিরমিযী ১/৮৩]

যখন আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ' বা 'সুবহানা রব্বিই', আমরা আল্লাহ যে সমস্ত রকম অপূর্ণতা বা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত তা ঘোষণা করছি। আর 'রব্বিই' বলতে 'আমার রব' বোঝায়, যা দিয়ে আমাদের সাথে আল্লাহর অতি নিকট-সম্পর্ক ও ভালোবাসা অনুভব করি।

২।

سُبُّوحٌ، قُدُوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

সুব্বুহুন, কুদ্দুসুন, রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররুহ

“ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদস (জিব্রাঈল আঃ) এর রব প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত এবং গুণাবলীতেও পবিত্র।” [মুসলিম ১/৩৫৩, আবু দাউদ ১/২৩০]

৩।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী

“হে আল্লাহ! আমাদের রব। তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসা সহ। হে আল্লাহ আমাকে তুমি মাফ করে দাও।” [বুখারী ১/৯৯, মুসলিম ১/৩৫০]

৪।

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي”

আল্লাহুম্মা লাকা রাকা’তু ওয়াবিকা ‘আ-মানতু ওয়ালাকা আসলামতু খশা’আ লাকা সাম’ঈ ওয়া

বাসারী ওয়া মুখখী ওয়া 'আযামী ওয়া 'আসাবী ওয়া মাতাক্বল্লাবিহী ক্বদামী

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিস্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্তা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।" [মুসলিম ১/৫৩৪]

৫।

"سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ"

সুবহানা যীল জাবারু-তি ওয়াল মালাকু-তি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযামাতি

"পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।" [আবু দাউদ ১/২৩০]

পরের পর্বে রুকুর আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২৩

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আলহামদুলিল্লাহ, কুরআনের আলো ওয়েবসাইটের জনপ্রিয় সিরিজ "কিভাবে নামাজের মাধুর্য আস্বাদন করা যায়" নিয়ে আমরা আবারও পোস্ট শুরু করেছি। আমরা এখন নামাজের রাকা'আতের মাঝামাঝি অবস্থায় আছি। এই পর্যায়ে আমরা একটু পিছনে ফিরে দেখব আর নিজেকে প্রশ্ন করব, 'আমার নামাজের অবস্থার কি কোন উন্নতি হয়েছে? আমি কি এখন আল্লাহর সাথে আগের চেয়ে

আরও বেশী ঘনিষ্ঠতা অনুভব করি?’ নিচে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আপনি পেছনের পর্ব গুলোতে চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন।

বিভিন্ন প্রবন্ধের উপর চোখ বুলিয়ে তা থেকে একটা বা দুইটা বিশেষ কোন পয়েন্ট নির্বাচন করা বা পছন্দ করে নেওয়া সহজ। কিন্তু এই ধরনের প্রবন্ধ পড়ার আগেই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে নিয়ে পড়া জরুরী। যখন এই সিরিজটি দেখছিলাম তখন বুঝতে পারছিলাম যে আমার নামাজে কি পরিমান কমতি ছিল। আর বুঝলাম নামাজের প্রতিটি ভঙ্গীতে কি গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে, আর কি করে তা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নতুন নতুন পথ করে দেয়।

রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো

রুকুর পর মহানবী (সাঃ) পিঠ সোজা করে উঠে দাঁড়াতেন, বলতেন-

سمع الله لمن حمده

সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ

‘যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার কথা শোনেন।’(বুখারী ৭৫৯, ইফা)

আমরা বেশিরভাগ মানুষই এই জায়গাটাতে তাড়াহুড়া করে ফেলি; আমরা যখন রুকু থেকে উঠে দাঁড়াই, তার পরপরই সাথে সাথে সিজদায় চলে যাই। অথচ, যখন মহানবী (সাঃ) রুকু থেকে উঠে দাঁড়াতেন, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড সোজা করে কিছুক্ষন দাঁড়াতেন।

যেমন আগের পর্বে বলা হয়েছে, তাঁর রুকু, **রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকার সময়**, সিজদা এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বসার সময় প্রায় সম পরিমান হত (বুখারী ৭৫৬, ইফা)।

উঠে দাঁড়ানোর পরের দোয়া

এই সময় কয়েকভাবে দোয়া করা যায়, তম্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

ربنا ولك الحمد

রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ

অথবা,

ربنا لك الحمد

রব্বানা লাকাল হামদ.

“হে আমাদের রব! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা”

বা,

ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহ

“হে আমাদের রব! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগনিত পবিত্রতা ও বরকতময় প্রশংসা”

রাসুল (সাঃ) একবার সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ‘সামি’ আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহ’ বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন রাসুল (সাঃ) বললেনঃ ‘আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশী ফেরেশতা এর সওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।’ (সহীহ বুখারী ৭৬৩, ইফা)

সুবহানাল্লাহ !!

কেন রুকু থেকে উঠে ‘আল্লাহু আকবার’ বলি না?

নামাজে প্রায় প্রতিটি ভঙ্গী পরিবর্তনের সময় আমরা বলি ‘আল্লাহু আকবার’, শুধু এই জায়গায় ছাড়া, কেন? কারণ আমরা এখন সিজদার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমরা জানি সিজদা হল সেই অবস্থান যেখানে আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকেন, এবং যেখানে দোয়া কবুল হয়। কাজেই আমরা সেই দোয়া কবুল হওয়ার সুযোগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তার ঠিক আগেই আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে (কারণ যারা আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তাদের কথা শোনেন) এবং তার পর সিজদায় যেয়ে দোয়া করছি।

আল্লাহ যেন আমাদের নামাজকে আরও সুন্দর করার তৌফিক দেন যাতে আমাদের অন্তর আরও বেশী করে আল্লাহর সান্নিধ্য অনুবভ করতে পারে। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২৪

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আমরা যখন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করি, আমাদের খুশু থাকা উচিত কারণ আমরা আল্লাহর কালাম বা কথা পড়ছি। আমরা যখন সিজদায় যাই, আমরা জানি আল্লাহ আমাদের প্রার্থনার জবাব দেন, তাই আমরা বেশী মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে রুকুতে আমাদের মনের কি অবস্থা থাকা উচিত?

আত্মার চাহিদা পূরণ

আমাদের সবারই কিছু প্রাত্যহিক চাহিদা আছে। একজন বাবা অপেক্ষায় থাকেন কখন কাজ থেকে ঘরে ফিরে শিশু সন্তানকে আলিঙ্গন করবেন, সন্তান যদি ঘুমিয়েও থাকে, বাবা অন্ততঃ একটি চুমু খান মনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। যখন আমরা খুব বেশী ক্ষুধার্ত থাকি, আমরা মাঝে মাঝে বেশী ক্লান্ত বা খিটখিটে হয়ে যাই যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু খেয়ে নেই। ঠিক যেমন আমাদের মনের ও শরীরের চাহিদা আছে, আমাদের আত্মারও কিছু চাহিদা আছে। সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্য আত্মা তৃষ্ণার্ত থাকে। অনেকেই বুকের ভেতর শূন্যতা অনুভব করেন, আর সেটাকে পূরণ করার জন্য অন্য কিছুর সন্ধান করেন। কিন্তু যেমন একজন ক্ষুধার্ত মানুষ দৌড়িয়ে তার ক্ষুধার চাহিদা মেটাতে পারে না- তা অবাস্তব; ঠিক তেমনি এই আত্মার তৃষ্ণাও সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছুতে মেটানো সম্ভব না।

রুকুর মাধ্যমে বিনম্রতা

আত্মার বিনম্রতার মাধ্যমেই সত্যিকারের আনুগত্য সম্ভব, আর রুকু তারই একটি বহিঃপ্রকাশ। হাকিম বিন হিজাম নামক জনৈক আরব ইসলাম কবুল করার সময় রাসুল (সাঃ) কে বলেছিল যে, সে সমস্ত নির্দেশ পালন করবে শুধু নামাজের সময় রুকু করা ছাড়া, কারণ তাতে বিনীত হতে হয়। কাজেই আমরা যখন রুকুতে যাবো, আমরা সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখব যেন রুকু অবস্থায় আমাদের মেরুদণ্ড ঠিক মতো সোজা থাকে (মাটির সাথে সমান্তরাল), মাথা ঠিক মতো যথেষ্ট নোয়ানো থাকে, এবং "*সুবহানা রব্বিআল 'আযীম*" (আমি আমার মহার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) কথাটির উচ্চারণ যেন আমাদের মনের গভীর বিশ্বাস থেকে হয়।

যখন আমরা বলি "সুবহানা রব্বিআল 'আযীম", আমরা আল্লাহর সুবহানা ওয়াতা'আলার একত্ববাদও প্রকাশ করছি। 'রব' শব্দটি একাধিক অর্থ প্রকাশ করে- রব বলতে বোঝায় মালিককে, রক্ষাকর্তাকে, পালনকর্তাকে। আমরা যখন চিন্তা করি আমাদের যা যা আছে তা নিয়ে- আমাদের পোশাক, আমাদের সম্পদ, আমাদের সুস্বাস্থ্য, আমাদের প্রিয়জন- কে দিয়েছেন? তখন আমরা কিভাবে আমাদের রবের সামনে অবনত না হয়ে পারি? আর কিভাবেই বা আমরা তাঁর সাথে সেই বিশেষ অন্তরঙ্গতা অনুভব না করে পারি যে- তিনিই 'রব্বী', 'আমার রব'?

মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা

রাসুল ﷺ বলেনঃ

أما الركوع فعظموا فيه الرب

“তোমরা রুকু অবস্থায় মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করবে” (মুসলিম ৯৬৭, ইফা)

আপনি যখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানবেন, আর মহিমা বর্ণনাকারী কথাগুলো অন্তর থেকে প্রতিফলন ঘটাবেন, তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতিই আপনার মনে যেন গভীর শ্রদ্ধা থাকে। আল্লাহ তা’য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার তাক্বওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। (সূরা হাজ্জঃ ৩২)

কাজেই রুকুতে গভীর শ্রদ্ধাবোধ অন্তরের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি থেকেই আসে, আর আমরা সবাই যেন সেই তাক্বওয়া অর্জনে সচেষ্ট হতে পারি ইনশাআল্লাহ। ইবনে আল কায়্যিম বলেছেন, রুকু হল অনেকটা সিজদার ভূমিকার মতই, যেখানে আমরা এক স্তর থেকে আরেক গভীরতর স্তরে আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হই। রুকুতে বিনয়াবনত হওয়ার এই প্রচেষ্টায় আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। এবং সেই বিখ্যাত হাদীসে কুদসীটি আমরা এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারি-

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, “যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার

দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" (বুখারীঃ ৭৫৩৬, মুসলিমঃ ২৬৭৫)

আমরা যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বেশী বেশী নেক আমল করি, আল্লাহ আমাদেরকে ভালবাসেন, আর আল্লাহর ভালবাসার চেয়ে বেশী আর কি চাওয়ার আছে আমাদের? একারণে **রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর রুকু দীর্ঘ করতেন, এমনভাবে যে তাঁর রুকু, রুকুর পর উঠে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদা, এবং দুই সিজদার মাঝখানের বসার সময়টুকু প্রায় সমপরিমান দীর্ঘ হত।** মনে রাখবেন, তাঁর রুকু দৈর্ঘ্যও **রুকুর আগের তিলাওাতের সময়ের দাঁড়ানোর সমান হত। আর মাঝে মাঝে তিনি এক রাকা'আতে দাঁড়িয়ে একটানা সূরা বাক্বারা, সূরা নিসা, সূরা আল-ইমরান তিলাওয়াত করে শেষ করতেন, এবং তা ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়তেন** (সহীহ মুসলিমঃ ১৬৯১, ইফা)।

মুসলিম বিন মাক্বী একবার আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাঃ) এর নামাজের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে রুকুতে যেতে দেখলাম। ঐ সময় আমি সূরা বাক্বারা, সূরা আল-ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা তেলাওয়াত শেষ করে দেখলাম তিনি তখনও সেই রুকুতেই আছেন।'

সুবহানআল্লাহ !!!

আমরা অনেকেই হয়তো এতে অনুপ্রাণিত হবো, কিন্তু অনেকেরই মনে হবে, 'আমি কখনই ঐ পর্যায়ে পৌছতে পারব না' এবং এই জন্য কোনদিন চেষ্টাও করবেন না। তবুও, একবার মনে করুন সেই হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহর বান্দার কথা যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এক বিঘতই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। যতক্ষণ আমরা আমাদের নামাজের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করব, ততক্ষন অন্ততঃ হাদিসটির এই অংশটুকু আমাদের বাস্তবায়িত হতে থাকবে।

আল্লাহ যেন আমাদের রুকুর মাধুর্য আস্বাদনের তৌফিক দেন। আমীন

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?

পর্ব ২৫

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

আমরা এখন সিজদায় এসে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ্। ইবনে আল কায়্যিম বর্ণনা করেন, সিজদা হল সালাতের গুপ্তধন, সবচেয়ে বড় স্তম্ভ, এবং রুকুর পূর্ণ পরিসমাপ্তি। তিনি বলেন, সিজদার আগের সব কাজ ছিল শুধুই ভুমিকা।

আমরা এখন একটু পেছনে যাবো এবং ভেবে দেখব- আমরা যখন সিজদায় যাই, তখন আমাদের কি অনুভূতি থাকে? আমাদের মাঝে অনেকেই ভাবেন, এটা নামাজের অংশ তাই সিজদা করি; আবার অনেকে চিন্তা করেন এটা হল সেই জায়গা যেখানে প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু আমরা কয়জন অনুভব করি যে, এটা হল আমাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠতম বিনয় যা আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতা ঘোষণায় আমাদের মাথা মাটিতে লুটিয়ে প্রকাশ করি?

সত্যিকারের সুখ

আমরা কোথায় সুখ পাই? বস্তুবাদী সুখ নয়, সত্যিকারের আত্মার সুখ। মুসলিম হিসেবে আমরা বলতে পারি, জগতে সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায় আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারলে। আপনি যত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারেন, আপনার হৃদয় ততই শান্তি পায়।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য, সিজদায় চলে যান। মহানবী (সাঃ) বলেন-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

বান্দার সিজদারত অবস্থাই প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা [মুসলিম ৯৭৬]

আপনি সিজদায় যত বেশী বিনীত হতে পারবেন, তত বেশী আপনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন; এবং নিশ্চয়ই তিনি এতে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

‘তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশী বেশী সিজদা করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দেবেন।’ [মুসলিম ৯৮৬, ইফা]

একারনেই যখনই আমাদের রাসুল (সাঃ) এমন কিছু পেতেন যাতে তিনি খুশী হতেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। আল্লাহ বলেন-

وَاقْتَرِب [٩٦:١٩] وَاسْجُدْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ[[۩]]

কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। [সূরা ‘আলাক্বঃ ১৯] [[۩]]

জান্নাতের দিকে আরোহণ

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, সিজদার সময় মানুষের আত্মাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করা হয়। আপনি যত বেশী বেশী সিজদা করবেন, আপনার মর্যাদা জান্নাতে তত বেশী বাড়ানো হবে ইনশাআল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছবেন; জান্নাতুল ফেরদউসে, আর এখানেই রাসুল (সাঃ) থাকবেন। আর এই স্তরের উপরেই হল পরম দয়ালু আল্লাহর সিংহাসন। আমরা কিভাবে জানি যে সিজদার সাহায্যে এটা অর্জন করা সম্ভব? সাহাবী রবী'আ ইবনে কা'ব আল আসলামী (রাঃ) বলেন-

আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম।

তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাও।

আমি বললামঃ বেহেশতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি।

তিনি বললেনঃ এ ছাড়া আরও কিছু আছে কি?

আমি বললামঃ এটাই আমার আবেদন।

তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর। [মুসলিমঃ ৯৮৭; ইফা]

অন্তরের সিজদা

অন্তর কি কখনও সিজদা করে? করে, এবং শরীরের চেয়ে বেশী করে। অন্তরের সিজদা হল এর বিনয়; যেমন কেউ শারীরিকভাবে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু অন্তর তখনও বিনয়াবনত থাকতে পারে অর্থাৎ সিজদায় নত থাকতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ অন্তর থেকে জানে যে - তিনি আল্লাহ্ যিনি পথপ্রদর্শন করেন, যিনি মানুষকে সম্মানিত ও অপমানিত করতে পারেন, যিনি দয়া করেন আবার শাস্তিও দেন, এবং যিনি অন্তরসমূহ থেকে দুঃখ ও কষ্ট দূর করে দেন। আপনার অন্তর যদি কোনদিন এক বিশেষ রকম শূন্যতা অনুভব না করে থাকে, বিনম্রবোধ না থেকে থাকে, তাহলে আপনার অন্তরে সিজদার এক বিশেষ উপাদানের অভাব আছে।

মিশারী আল খাররাজ নামের একজন দাঈ একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কিভাবে বুঝব আমার অন্তরে বিনম্রতা আছে কিনা?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যখন বিনম্র বোধ করবেন, তখন নিজেই বুঝতে পারবেন।' আপনার অন্তর আল্লাহর সামনে শ্রদ্ধায় বিনয়াবত হয়ে আছে, অথচ আপনি তা বুঝতে পারবেন না, এমনটি হবার নয়। কুরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ

سيماهم في وجوههم من أثر السجود

"...তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে..." (সূরা ফাতহঃ ২৯)

বেশীরভাগ মানুষই মনে করে এখানে মুখের সেই চিহ্নের কথা বলা হয়েছে যা সিজদার কারণে অনেক সময় মানুষের কপালে তৈরি হয়। তথাপি, এই আয়াতের ব্যখ্যায় মুজাহিদ বলেছেন, এই চিহ্ন বুঝিয়েছে

খুশুর কারণে তৈরি হওয়া বিনম্রতা থেকে, আর এটা শুধু এই দুনিয়াতেই। আর আল-জালালাইন একে সেই নূর হিসেবে ব্যখ্যা করেন যার সাহায্যে আখিরাতে মু'মিনদেরকে চেনা যাবে। রাসুল (সাঃ) বলেনঃ

إن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء

"সেই দিন আমার উম্মতের লোকদের সিজদার কারণে চেহারা উজ্জ্বল থাকবে, আর ওযুর কারণে তাদের হাত পা গুলো উজ্জ্বল থাকবে। (আহমাদ)

সিজদা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে শয়তান আমাদেরকে এর জন্য ঘৃণা করে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন -

যখন কোন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে একপাশে সরে দাঁড়ায় এবং বলতে থকেঃ 'হায় আমার পোড়া কপাল! আদম সন্তানকে সিজদা করার নির্দেশ করা হলে শে সিজদা করল। ফলে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকেও সিজদার নির্দেশ করা হয়েছিলো কিন্তু

আমি অস্বীকার করলাম, তাই আমার জন্য জাহান্নাম।’ (মুসলিমঃ ১৫২; ইফা)

আল্লাহর নৈকট্য

সুবহানাল্লাহ! এই মানুষটি রাসুল (সাঃ) এর মসজিদে নববীতে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা জানি না কি তার পরিচয়, তিনি জীবনে কি করেছিলেন; শুধু এইটুকু জানি আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে নিকটতম অবস্থায় পেয়ে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য আল্লাহ্‌ তাকে দিয়েছেন।

আমাদের শেষ অবস্থা অনুযায়ী আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। আমরা কি অবস্থায় থাকব তখন?

আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সালাতকে আরও সুন্দর করার তৌফিক দান করেন, এবং আমাদের অন্তরকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আরও সুযোগ করে দেন। আমীন

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২৬

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

সিজদার সময় রসুল (সাঃ) সাত অঙ্গ দিয়ে সিজদা করতেন (নাক সহ কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এর আঙ্গুল সমূহ) [বুখারী ৭৭৫; ইফা]। উভয় হাত এরূপ ফাঁকা রাখতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত (বুখারী ৭৭০; ইফা)। তিনি উভয় পায়ের আঙ্গুল এ সময় কিবলামুখী রাখতেন (বুখারী অনুচ্ছেদ ৫২২; ইফা)। তিনি(সাঃ) সিজদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বলেছেন, এবং কুকুরের মতো দুই হাত বিছিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন (বুখারী ৭৮৪; ইফা)

রাসুল (সাঃ) সিজদায় বেশী বেশী পড়তেন-

১) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

'সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী'

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আপনার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" [বুখারী ৭৮০; ইফা]

এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় সিজদায় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন, তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হল-

২) سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

“সুবহানা রব্বিয়াল ‘আলা”

অর্থঃ আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিনবার) [সহীহ আত তিরমিযী ১/৮৩]

৩) سُبُّوحٌ، قُدُّسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

“সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররুহ”

অর্থঃ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদ্দুস (জিব্রাঈল আঃ) এর রব প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় এবং গুনাবলীতে পবিত্র। [মুসলিম ১/৫৩৩]

৪) اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়াবিকা ‘আ-মানতু ওয়ালাকা ‘আসলামতু সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খলাক্কাহু ওয়াসাওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সাম‘আহু ওয়া বাসারাহু তাবারকাল্লাহু আহসানুল খ-লিক্কীন”

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন,

মহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা। [মুসলিম ১/৫৩৪]

৫) “ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرْوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ”

“সুবহানা যিল জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল ‘আযামাতি ”

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী। [আবু দাউদ ১/২৩০]

৬) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

“আল্লাহুম্মাগফিরলী যানবীকুল্লাহু, দিক্বাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউওয়ালাহু ওয়াআ-খিরাহু ওয়া ‘আলানিয়াতা ওয়া সিররাহু”

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহ। [মুসলিম ১/৩৫০]

৭) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া বিমু’আ-ফাতিকা মিন ‘উক্বুবাতিকা ওয়া ‘আউযু বিকামিনকা, লা-উহসী সানা-আন ‘আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা ‘আলা নাফসিকা”

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, তোমার শাস্তি হতে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার গজব হতে। তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছ। [মুসলিম ১/৩৫২]

এই সহজ দোয়াগুলো আমরা শিখে নিই এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দোয়াগুলো যেকোনো একটি করে বিভিন্ন সময়ে পড়ি, যাতে নামাজের অতি অভ্যস্ততার কারণে অমনোযোগিতা আমরা দূর করে খুশু বৃদ্ধি করতে পারি। সেই সাথে কিছু সুন্নাহ জাগ্রত করতে পারি।

প্রথম সিজদার পর রাসুল (সাঃ) মাথা উঠানোর পর সুস্থির হয়ে বসতেন।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন- *"...ধীর স্থির ভাবে সিজদা করবে। এরপর সিজদা থেকে উঠে স্থির ভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে।..." (বুখারী ৭৫৭; ইফা)*

দুই সিজদার মাঝে তিনি (সাঃ) প্রায় সিজাদার সমপরিমাণ সময় বসে থাকতেন। এসময় তিনি বলতেন,

اللَّـهُمَّ اغْفِرْ لِـي، وَارْحَمْنِـي، وَاهْدِنِـي، وَاجْبُرْنِـي، وَعَافِنِـي، وَارْزُقْنِـي، وَارْفَعْنِـي

“আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া‘আফিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়ারফা’নী”

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমার উপর রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পুরন করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং তুমি আমাকে রিজিক দান করো, ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। [সহীহ আত-তিরমিযী ১/৯০]

(বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দগুলোর বিভিন্ন ক্রম পাওয়া যায়।)

আবার কখনও কখনও বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

“রব্বিগফিরলী রব্বিগফিরলী”

অর্থঃ হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। [আবু দাউদ ১/২৩১]

ক্ষমা

আমরা যখন উপরের দোয়াটি পড়ি, আমদের মধ্যে বেশীরভাগই এর সাধারণ অর্থটি জানি, যে 'মাগফিরাত' অর্থ ক্ষমা। কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা নামাজের কথা ও কাজের মধ্যকার অন্তর্নিহিত অর্থ শেখার চেষ্টা করছি, আমাদের এই ধরনের অন্ততঃ কিছু শব্দের তাৎপর্য আরও গভীরভাবে জানা উচিৎ। ইবনে আল কায়্যিম বলেছেন, মাগফিরাত হল গুনাহ মুছে ফেলা, এর চিহ্ন দূর করে ফেলা, এবং এর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা। এটি 'মিগফার' শব্দ থেকে এসেছে। যোদ্ধারা নিজেদের মাথাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে যে ধাতব হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে তাকে আরবীতে মিগফার বলা হয়। মিগফার যেমন মাথাকে আঘাতের ক্ষতিকর পরিণতি থেকে রক্ষা করে, মাগফিরাতও মানুষকে গুনাহের ক্ষতিকর পরিণতি থেকে রক্ষা করে। আবার মিগফার যেমন মাথাকে ঢেকে রাখে, মাগফিরাতও মানুষের ত্রুটিকে আড়াল করে রাখে। এভাবে আল্লহ যখন আপনার উপর মাগফিরাত বর্ষণ করেন, তিনি আপনাকে আপনার কৃত পাপের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, আপনার পাপকে অন্যদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন। আমরা এরকমটাই প্রার্থনা করি যখন আমরা বলি- 'রব্বিগফিরলী'।

দুই সিজদা

প্রতি রাকা'আতে আমরা একবার রুকু দেই, এবং দুইবার সিজদা দেই। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, কেন? ইবনে আল কায়্যিম বলছেন- এটা একারণে যে, সিজদা হল নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, আর এই গুরুত্ব বোঝা যায় এর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পারার মাধুর্য আবার আস্বাদন করার আকাঙ্ক্ষায় আরেকবার সিজদায় লুটিয়ে পরি।

রাকা'আতের শুরু করি তিলাওয়াতের মাধ্যমে, আর শেষ করি সিজদার মাধ্যমে; ঠিক যেমন রাসুল (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ প্রথম সূরা, সূরা 'আলাক্ব শুরু হয়েছে এভাবে-

‘পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ (সূরা ‘আলাক্বঃ ১)

এবং সেই সূরা শেষ হয়েছে এভাবে-

“কখনই নয়, আপনি তার (অবিশ্বাসীদের) আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন” [সূরা ‘আলাক্বঃ ১৯] [[۩]]

সুবহান আল্লাহ্!!!!

আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে নামাজের প্রতিটি ধাপের তাৎপর্য বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২৭
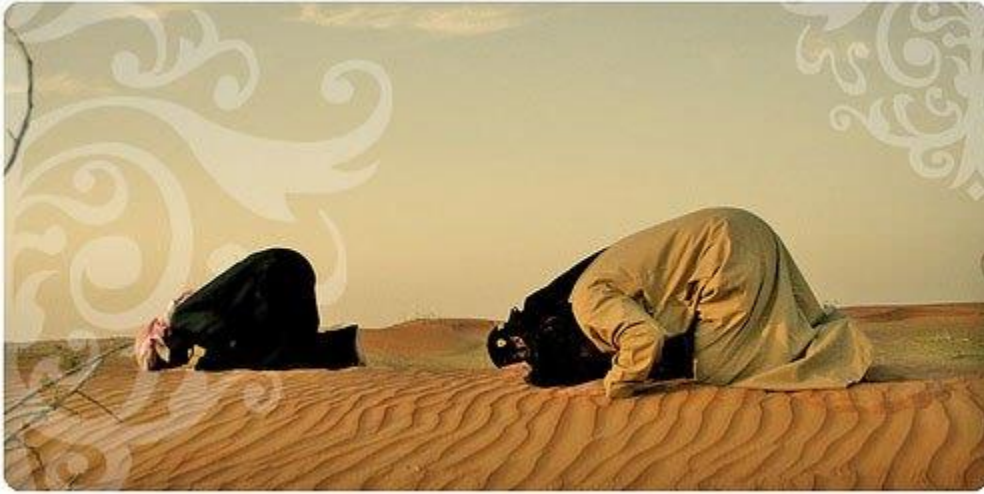
রহমান রহীম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে-

আমরা নামাজের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, আল্লাহর সাথে আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের শেষ পর্যায়ে। আজকের পর্বে আলোচনা করব তাশাহুদ সম্পর্কে। দুই রাকা'আত নামাজের পর দ্বিতীয় সিজদার পর রাসুল (সাঃ) সোজা হয়ে বসতেন। তিন অথবা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাজে(যোহর/আসর/মাগরিব/'ইশার ফরজ নামাজে) দ্বিতীয় রাক'আতের পর তিনি (সাঃ) বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকা'আতে বসতেন তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন (সহীহ বুখারী ৭৯০; ইফা)।

বাম হাত বাম উরুর উপর, ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন (মুসলিম ১১৯৫; ইফা)।

অন্য এক বর্ণনায়, ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন (মুসলিম ১১৯৬; ইফা)।

অপর এক বর্ণনায়, দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন (মুসলিম ১১৯৭; ইফা)।

এ সময় তিনি (সাঃ) শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) দিয়ে ইশারা করেতেন (মুসলিম ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯; ইফা) এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন (মুসলিম ১১৯৬ ইফা)।

তাশাহুদ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বৈঠকের শুরুতে বলতেনঃ

التحياتُ لله ، والصلوات والطيبات

“আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওাতি ওয়াত্তায়্যিবাতু...” অর্থাৎ, সকল মৌখিক, দৈহিক, আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য...। (সহীহ বুখারী ৭৯৩)

আমরা যখন এটি বলব তখন আমাদের সেই গুপ্তধন প্রয়োগ করতে হবে যার কথা আগেই বলা হয়েছে, যেমন এটা মনে করা যে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা হচ্ছে। কাজেই চলুন আমরা যেই কথাগুলো উচ্চারন করছি তার অর্থ আরও গভীরভাবে জেনে নেই।

আত-তাহিয়্যাতঃ আমরা ঘোষণা করি যে, শান্তি, রাজত্ব, এবং চিরন্তন আধিপত্যসহ যাবতীয় প্রশংসাসূচক বাক্য আল্লাহর জন্য। ইবনে আল উসাইমীন বলেন, এটি মহত্ব ও শ্রদ্ধা ব্যঞ্জক একটি শব্দ।

আস-সালাওাতঃ আমরা ঘোষণা করি যে, সমস্ত দুআ ও প্রার্থনা আল্লাহর কাছে।

আত-তায়্যিবাতঃ আমরা ঘোষণা করি যে, যা কিছু ভাল কর্ম বা আমল করা হয় তা আল্লাহরই জন্য।

একটি ভিন্ন জায়গায় গমন

উপরে উল্লেখিত কথা গুলো বলার পরে আমরা যা বলি, তা ভিন্ন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যায়, হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, আপনি কোথায় অবস্থান করছেন তার উপর নির্ভর করে। কোথায় সে জায়গা?

এটা সেই জায়গা যেখানে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) শায়িত আছেন; রহমতের শহর মদীনাতে। এই কথাগুলো যা আমরা প্রতিটি নামাজে উচ্চারন করি, তা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়ঃ

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

"আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"

যার অর্থ- নবীর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

এই কথাগুলো যে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পৌঁছে যায় আমরা তা কিভাবে জানি? রাসুল (সাঃ) বলেছেন- *'যে কেউই যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার রূহ ফেরত দেন এবং আমি সেই সালামের জবাব দেই।' [আবু দাউদ ২০৩৭; ইফা]*

এখন আপনার ঘরের দরজাটির দিকে তাকান এবং কল্পনা করুন। কল্পনা করুন যে এই মুহূর্তে এই দরজা থেকে প্রিয় রাসুল (সাঃ) হেঁটে এসেছেন। কল্পনা করুন মাথায় পাগড়ি, গায়ে সাদা জোব্বা, উজ্জ্বল মুখ আর ঘন কালো দাঁড়ি, আর সেই অপূর্ব হাসি মুখে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন আপনার সুযোগ এসেছে তাঁকে সালাম দেওয়ার; তাহলে এখন কিভাবে জানাবেন তাঁকে সালাম? কেমন হবে আপনার অনুভূতি?

ভাবুন, সেই সাহাবাগণ (রাঃ) এর কথা যারা মদীনায় বাইরে দাঁড়িয়ে রাসুল (সাঃ) এর পৌঁছার অপেক্ষা করতেন। তাঁরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করতেন; প্রতিদিন আশায় আশায় একই জায়গায় এসে অপেক্ষা করতে থাকতেন। অবশেষে যখন তাঁর দেখা পেতেন, ভেবে দেখুন কেমন আনন্দ তাদেরকে বিভোর করে ফেলত, কিভাবে তাঁরা আনন্দে গেয়ে উঠতেন সেই গান যা আজও শিশুদেরকে শেখানো হয়- 'তা-লা আল বাদরু 'আলাইনা', কেমন করে প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হুড়োহুড়ি পরে যেত রাসুল (সাঃ) কে সালাম দেওয়ার জন্য! আমরা যদি সেসময় সেখানে থাকতে পারতাম!

তখন আপনার মধ্যে কেমন অনুভূতি কাজ করত? আমরা কখনও সেই সময়টিতে সেইখানে যেতে পারব না, কিন্তু অন্ততঃ এখন এই মুহূর্তে আমরা যে যেখানে আছি, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আমাদের সালামগুলো এইখান থেকেও তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তিনি জবাব দেবেন। এই অপূর্ব সুযোগটিকে হাল্কাভাবে নেবেন না; বরং আসুন আমরা এই কথাগুলো আমাদের অন্তর থেকে বলি সেই গভীর ভালোবাসা নিয়ে বলি যেমনটি আমরা বলতাম যদি তিনি আমাদের সামনে থাকতেন।

আমাদের এবং সৎকর্মশীলদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক

আমরা এরপর বলিঃ

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

“আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লাহিসস্ব-লিহীন”

যার অর্থ- আমাদের এবং সৎকর্মশীলদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, *যখন কেউ এতটুকু পড়ে, তখন আসমান ও যমীনের আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের কাছে তা পৌঁছে যাবে। [সহীহ বুখারী ৫৮৮৯; ইফা]।*

তারপর তিনি বলতেনঃ

أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله

“আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন-না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রসুলুহু”

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তিন অথবা চার রাকা’আত বিশিষ্ট নামাজ হলে এর পর তিনি পরবর্তী রাকা’আতের জন্য উঠে দাঁড়াতেন।

আল্লাহ্ যেন আমাদের নামাজের প্রতিটি কাজের তাৎপর্য বুঝার ও অনুভব করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

কিভাবে নামাজের মধুরতা আস্বাদন করা যায়?
পর্ব ২৮ (শেষ পর্ব)

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

রাসুল (সাঃ) যদি প্রথম তাশাহুদ পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি তৃতীয় রাকা'আতের জন্য তাকবীর দিয়ে (আল্লাহু আকবর বলে) উঠে দাঁড়াতেন। আর যখন তিনি শেষ তাশাহুদ পড়তেন, তিনি তারপর বলতেন,

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরহীমা ওয়া আ-লি ইবরহীম, ইন্নাকা 'হামীদুম মাজীদ; আল্লাহুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিওওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরহীমা

ওয়া ‘আলা আ-লি ইবরহীম, ইন্নাকা ‘হামীদুম মাজীদ।

“হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।” [বুখারী ও মুসলিম]

এখন চলুন, এর অর্থগুলোর দিকে লক্ষ্য করিঃ

* মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি রহমতের প্রার্থনা- (ইবনে হাযার এর বর্ণনায়) আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছেন রাসুল (সাঃ) এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য।

* মুহাম্মাদ (সাঃ) উপর বরকত নাযিলের প্রার্থনা- আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তিনি রাসুল (সাঃ) এর উপর যে রহমত করেছেন তা আরও বৃদ্ধি করে দেন;

অর্থাৎ, আল্লাহ যেন মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সেই সব নেয়ামত দান করেন যা কিছু ইবরাহীম (আঃ) কে দান করেছিলেন এবং তা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

রাসুল (সাঃ) তাঁর উপর দুরুদ পাঠের ফজীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন-

من صلى عليَّ صلاة واحدة، صلى الله عليه عشر صلوات، وحُطت عنه عشر خطيئات، ورُفعت له عشر درجات

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পাঠ করে (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" [সহীহ নাসাঈঃ ১২৩০]

রাসুল (সাঃ) এর উপর দুরুদ পাঠের পর

যখন মহানবী (সাঃ) একবার একজন লোককে নামাজে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে এবং তার পর নবী (সাঃ) এর উপর দুরুদ পাঠ করতে শুনলেন, তিনি বললেন-

"দু'আ কর, তোমার দু'আর জবাব দেওয়া হবে; প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে।" [নাসাঈ]

লক্ষ্য করুন, তাশাহুদে কিভাবে দু’আ করার আদব ধারাবাহিকভাবে পালন করা হয় যাতে আমাদের দু’আ কবুল হয়ঃ আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর রাসুল (সাঃ) এর উপর সালাম ও দুরুদ পাঠ, এবং এরপর আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আমাদের প্রার্থনা করতে পারি, ঠিক যেভাবে করলে আমাদের দু’আর জবাব দেওয়া হবে বলে রাসুল (সাঃ) বলেছেন।

এর পর তিনি (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন,

“তোমরা কেউ যখন তাশাহুদ পড় তখন চারটি জিনিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করো। এই বলে দু’আ করবেঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নামা, ওয়া মিন আযা-বিল ক্ববরী, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল। *(অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) [মুসলিমঃ ১২১১; ইফা]*

কারও সাথে দেখা হওয়ার পর বিদায়ের আগে আমরা জিজ্ঞেস করি 'আমার কাছে কি আরও কিছু প্রয়োজন আছে?' আল্লাহ্‌র করুণা অসীম। আল্লাহ্‌র সাথে এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের শেষে এই দু'আ চাওয়ার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ যেন আমাদের বলেন, 'আরও কিছু কি আছে চাওয়ার?'

তাসলীম

এরপর, রসূল (সাঃ) ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেনঃ

السلام عليكم ورحمة الله

"আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ" অর্থাৎ "(হে মুক্তাদী ও ফেরেশতাগণ) তোমাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক" এবং বাম দিকে ফিরেও একই ভাবে একথা বলতেন। [তিরমিযী]

ডানে ও বামে মুখ ফিরানোর সময় পিছন থেকে রসূল (সাঃ) এর গালের সাদা অংশ দেখা যেত।

সালামের পর

সালাম ফিরানোর পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আমরাও এরূপ করে আমাদের নামাজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইব। এর পর আরও অনেক দু'আ আছে যা রসূল (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন।

কিন্তু, একটা বিষয়ে আমাদের সবার সাবধান থাকা উচিৎ, যে বিষয়ে রসূল (সাঃ)ও আমাদের জন্য আশঙ্কা করতেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন-

لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العُجْب العُجْب

“তোমরা যদি কোন গুনাহ না ও করতে, আরও একটি বিষয়ে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি যা এর চেয়েও বড়; আর তা হল আত্ম-সন্তুষ্টি (‘উজব)” [বায়হাকি]

অর্থাৎ, এখন যখন আমাদের নামাজের উন্নতি হয়েছে ইন শা আল্লাহ আর আমাদের খুশু বৃদ্ধি পেয়েছে, আমরা যেন কোনভাবেই নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে উত্তম বলে ধরে না নেই। ইবনে আল কায়্যিম বলেছেন- আত্মসন্তুষ্টি আমাদের আমলকে বিনষ্টও করে দেয়! আমাদের স্মরন করা উচিৎ আমাদের আগের সেই সব নামাজের কথা যা আমরা কোনরকম যেনতেনভাবে পড়েছি। এবং সবসময় মনে রাখা উচিৎ যে আমরা যা কিছু ভাল করতে সক্ষম, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র রহমতের কারণে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وما بكم من نعمة فمن الله

“তোমরা যেসব নিয়ামত ভোগ কর তা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে...” [সুরা নাহলঃ ৫৩]

নামাজের সত্যিকারের গুপ্তধন ও আনন্দ ভাণ্ডারের তুলনায় এই পর্যন্ত যা কিছু আমরা আলোচনা করলাম, তা আসলে মহাসাগরের তুলনায় একটি পানির ফোঁটার চেয়েও কম।

আমরা যেন যা কিছু শিখেছি তা আমাদের আমলে পরিণত করতে পারি, আর আমাদের প্রতিটি নামাজকে মহান আল্লাহ্‌র সাথে পবিত্র ও অপূর্ব সাক্ষাৎ বলে অনুভব করতে পারি। আমীন।

*এই আর্টিকেল ইংলিশ ওয়েবসাইট SuhaibWebb থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

*অনুবাদঃ quraneralo.com

*pdf: Hasan Ibn Saiful

Naseehah (দ্বীনি পরামর্শ)